বিদ্যামন্দির প্রাক্তনীবার্তা

অগস্ট ২০০৩

রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির প্রাক্তনী সংসদের মুখপত্র

বিদ্যামন্দির প্রাক্তনীবার্তা

পঞ্চদশ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, অগস্ট ২০০৩

উপদেষ্টা

স্বামী আত্মপ্রিয়ানন্দ

পৃষ্ঠপোষক

সুব্রত গাঙ্গুলি

প্রকাশক

তপনকুমার ঘোষ

সম্পাদক

গৌতম গোস্বামী
রামকুমার মুখোপাধ্যায়

প্রচ্ছদ

বিমলেন্দু দত্ত

মুদ্রণ

ডি. জি. অফসেট

৯৬ এন, মহারানী ইন্দিরা দেবী রোড, কলকাতা ৬০

৩ ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্ব : স্বামী দেবরাজানন্দ
গৌতম গোস্বামী

৬ প্রাক্তনী সংসদের বার্ষিক প্রতিবেদন
তপনকুমার ঘোষ

৮ সেই সময় ও আমরা
দিব্যেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

১০ বিদ্যামন্দির সমাচার

১৩ অন্তেবাসী— রাষ্ট্র, আইন ও মানবাধিকার
রামকৃষ্ণ রায়

১৭ কবিতা
অয়ন বিশ্বাস

১৮ ট্যান্টালাম আবিষ্কারের ২০০ বছর
সলিল মুখোপাধ্যায়

২০ পুরানো সেই দিনের কথা
অর্ধেন্দুশেখর দাশগুপ্ত

২২ সিলেট ভ্রমণ
রামকুমার মুখোপাধ্যায়

২৮ সু-শাসন!
দুর্গাদাস গোস্বামী

৩১ অতীতের পাতা থেকে

সম্পাদকীয়

বিদ্যামন্দির মূল্যায়ন

বিদ্যামন্দির-পর্বটি আমাদের জীবনে এমন কিছু দীর্ঘ নয়। কারো ক্ষেত্রে দু-বছর, কারো তিন, সামান্য কয়েকজনের ক্ষেত্রে বছর পাঁচেক। কিন্তু আমাদের জীবনে বিদ্যামন্দিরের প্রভাব খুবই বিস্তৃত এবং গভীর। ভৌগোলিক দূরত্ব বাড়লে অনেককিছুই মন থেকে হারিয়ে যায় কিন্তু বিদ্যামন্দিরের স্মৃতি মোছে না। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কত কিছুই ধূসর হয় কিন্তু মনের পর্দায় বিদ্যামন্দির একই রকম উজ্জ্বল থাকে। প্রাক্তনীদের স্মৃতিকথা পড়তে পড়তে মনে হয় হাত বাড়ালেই বোধ হয় ফেলে আসা দিনগুলিকে ছুঁয়ে ফেলা যায়, চাইলেই হাত রাখা যায় সেদিনের বন্ধুদের হাতে।

কিন্তু কেমন করে ঐ-সব কথা মনে ধরা থাকে? কী রয়েছে বিদ্যামন্দিরের ফেলে আসা দিনগুলির ভেতর যা সময়ের ঝড়বাদলকে উপেক্ষা করে? বিদ্যামন্দিরের পরীক্ষার ফলাফল ভালো হয়, কিন্তু আরো বেশ কিছু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আছে যেখানের ফলাফল কম উল্লেখযোগ্য নয়। বিদ্যামন্দির একটি আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কিন্তু দেশের একমাত্র আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নয়। কিন্তু ঐসব আবাসিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রাক্তনীরা কি একই রকম আবেগের অংশীদার তাদের প্রতিষ্ঠানের বিষয়ে? তেমন কথা আমরা শুনি না।

এখানেই বিদ্যামন্দিরের অনন্যতা। বিদ্যামন্দিরে ছাত্ররা আসে এবং যায় ঠিকই কিন্তু মালার ভেতর ফুলগুলি হারিয়ে যায় না। একটি শিক্ষা বৎসরের সবচেয়ে উজ্জ্বল ছেলেটির নামের পেছনে বাকিদের মুখ ঢাকা পড়ে না। বিদ্যামন্দির সবাইকে চেনে, ডাকতে পারে ব্যক্তি নামে, মনে করতে পারে বিশ বছর আগের চেহারা, বলতে পারে কোন গান গেয়েছিল পনেরো বছর আগের শারদ উৎসবে কিংবা কেমন করে বাঁ পায়ে গোল করেছিল তিরিশ ফুট দূর থেকে।

আসলে বিদ্যামন্দির কখনো প্রতিষ্ঠান হয়ে ওঠেনি, হয়ে উঠতে চায়নি। বিদ্যামন্দির শুধু তার ছাত্রদের চেনে না, ছাত্রদের ঘরসংসারের খবরও জানে। বলতে পারে কোন জেলায় বাড়ি, বাবার শরীরের খবর, ভাইয়ের পড়াশোনা। ডাক নামও জানা আছে কারো কারো। বিদ্যামন্দির আসলে এক যৌথ পরিবার যেখানে অন্যকে জানতে হয়, কথা বলতে, সুখের কথায় আনন্দ করতে হয়, দুখের কথায় 'আহা' বলতে হয়, ক্ষোভ হলে প্রকাশ করতে হয়। আর বিদ্যামন্দির পরিবার শুধু তার প্রাক্তনীদের মধ্যেও সীমাবদ্ধ নয়। প্রাক্তনীদের পরিবারের মানুষজনও এর অংশ। বিদ্যামন্দিরের মহারাজ, অধ্যাপক এবং নানা কর্মে নিযুক্ত ব্যক্তিরাও একই পরিবারভুক্ত। বিদ্যামন্দির প্রতিষ্ঠান হতে চায় না। বিদ্যামন্দির প্রতিষ্ঠান হয়ে উঠলে কেউ আর অভিযোগ করবেন না— 'অনেকদিন বিদ্যামন্দিরে আসেননি। আমাদের ভুলে গেলেন নাকি?'

ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্ব : স্বামী দেবরাজানন্দ

সাক্ষাৎকার : গৌতম গোস্বামী

মহারাজ, আপনি কত সালে বিদ্যামন্দিরে এলেন এবং কি পড়তে?

আমি ১৯৬৫ সালে সিউড়ির বীরভূম জেলা স্কুল থেকে হায়ার সেকেন্ডারি পাশ করে বিদ্যামন্দিরে আসি অর্থনীতি নিয়ে পড়তে।

সুদূর বীরভূম থেকে আপনি হঠাৎ বিদ্যামন্দিরে পড়তে এলেন কেন? এর পেছনে কি কোনো অনুপ্রেরণা ছিল?

আসলে আমার দাদা তখন প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়তেন। তিনি একবার বেলুড়মঠে এসে সন্ধ্যারতি এবং বিদ্যামন্দির ও তার পরিবেশ দেখে মোহিত হয়ে আমাকে বলেছিলেন পরীক্ষার ফল ভালো হলে বিদ্যামন্দিরে ভর্তি করবেন। ফল ভালো হল, বিদ্যামন্দিরে পড়ার সুযোগও পেয়ে গেলাম।

এখানে এসে আপনার প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া কী হয়েছিল? কেমন লেগেছিল এই পরিবেশ?

মনের মতো জায়গায় এসেছি মনে হয়েছিল। খুব ভালো লেগেছিল এর স্বর্গীয় পরিবেশ।

আপনার সময়ে বিদ্যামন্দিরের অধ্যক্ষ কে ছিলেন?

পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী তেজসানন্দজী মহারাজ। একেবারে শেষের দিকে পূজনীয় প্রভানন্দজী আসেন।

আপনাদের ছাত্রাবাসগুলির দায়িত্বে কোন কোন মহারাজ ছিলেন?

বিবেক ভবনে ছিলেন বিশ্বনাথ মহারাজ (স্বামী শান্তরূপানন্দজী, তখন ব্রহ্মচারী ছিলেন), শ্রী ভবনে প্রথমে দেবু মহারাজ (স্বামী স্মরণানন্দজী) পরে পরেশ মহারাজ (স্বামী ধ্যানেশানন্দজী), বিদ্যাভবনে প্রথমে দীনেশ মহারাজ পরে চিত্ত মহারাজ (দুইজনেই প্রয়াত) এবং বিনয় ভবনে— যতদূর মনে পড়ছে— প্রথমে চিত্ত মহারাজ (প্রয়াত) পরে প্রশান্ত মহারাজ এবং তারও পরে তন্ময়ানন্দজী মহারাজ। শেষ বছরে বিদ্যামন্দিরে গোলমালের পর পূজনীয় বাগীশানন্দজী এবং অমৃতত্বানন্দজী আসেন।

মহারাজ আপনি এই মাত্র যে গোলমালের কথা বললেন সেটা কি ধরণের?

সেই সময় প্রথম 'ঘেরাও' আরম্ভ হয়েছিল পশ্চিমবঙ্গে। সেই সদ্য আবিষ্কৃত ঘেরাও ছাত্ররা প্রয়োগ করেছিল বিদ্যামন্দিরে বিভিন্ন দাবিদাওয়া নিয়ে। 'ঘেরাও' ওঠাবার কোনো বন্দোবস্ত তখন ছিল না। সারা পশ্চিমবঙ্গ-ই তখন অশান্ত হয়ে উঠেছিল। তারই ছোঁয়া লেগেছিল বিদ্যামন্দিরেও। আমরা বেরিয়ে যাবার পর বছরখানেক বিদ্যামন্দির বন্ধও রাখতে হয়েছিল অশান্তির কারণে।

সেই সময় আপনাদের বিভাগে কোন কোন অধ্যাপক পড়াতেন? কার কথা বিশেষভাবে মনে পড়ে?

সেই সময় বিভাগীয় প্রধান ছিলেন অধ্যাপক কানাইলাল চক্রবর্তী। এছাড়া ছিলেন অধ্যাপক বাসুদেব বিশ্বাস, অধ্যাপক মৃন্ময় ভট্টাচার্য, অধ্যাপক বিপুল চক্রবর্তী এবং অধ্যাপক সুজিত ঘোষ। সবাই অসাধারণ ছিলেন। এরই মধ্যে মনে পড়ে কানাই বাবুর কর্তব্যনিষ্ঠা—বন্ধের দিন কলকাতা থেকে হেঁটে এসে শ্রী ভবনের কমন রুমে টেবিল-টেনিস বোর্ডকে টেবিল করে তার চারপাশে ছাত্রদের বসিয়ে নোট লেখানো। আর মনে পড়ে বাসুদেব বাবুর পড়ানো— অর্থনীতি বিষয়টি যে খুব সোজা (যে কোনো পেপার যে কোনো সময়ে জলের মতো বোঝানোর ক্ষমতা তাঁর ছিল) তাঁর ক্লাসে বসে মনে হত।

অন্য কোনো বিভাগের অধ্যাপকের কথা?

অন্য বিষয়ের মধ্যে অঙ্কের শচীন বাবুর কথা বিশেষভাবে মনে পড়ে। কারণ উনি 'পাশ'-এরও সব ছেলেদের নাম মনে রাখতেন। ঐ জন্য ভয়ও পেতাম।

বিদ্যামন্দিরে যেদিন প্রথম এলেন তার কিছু স্মৃতি মনে আছে?

এক রুমমেটের (নাম ভুলে গেছি) বাড়ি ফিরে যাওয়ার জন্য কান্না। শেষ পর্যন্ত কেঁদে কেটে অভিভাবকদের বুঝিয়ে দিন কয়েক পরেই বিদ্যামন্দির ত্যাগ।

সেই সময়ে কলেজের কোন স্মৃতি এখনো আপনাকে আনন্দ দেয়?

সে রকম আলাদা কোনো স্মৃতি আনন্দের কারণ নয়। বিদ্যামন্দিরে পড়ার সুযোগ পাওয়ায় এক মহত্তর জীবনের সন্ধান প্রথম পেয়েছি বলে বিদ্যামন্দিরের স্মৃতি সর্বদাই আনন্দের স্মৃতি।

হস্টেলের কোনো ঘটনা!

ভবিষ্যতে সংঘে যোগদান করব— এই ইচ্ছা নিয়ে তো পড়তে আসিনি। ভালো কলেজ, পরীক্ষার ফল ভালো হয়— তাই ভালো ফলের লোভে এখানে পড়তে আসা। কিন্তু হস্টেলের সকাল-সন্ধ্যায় প্রার্থনা, মাঝে মধ্যে আরতি করবার সুযোগ, বিবেকানন্দ পাঠচক্রে (রাত্রে খাওয়ার পর নিয়মিত বসত)

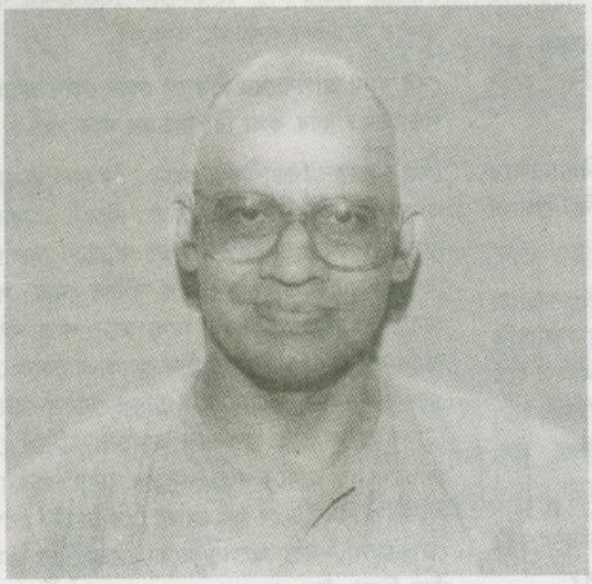

অংশগ্রহণ, সাধু-মহারাজদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশার সুযোগ— এ সবই চোখের সামনে এক নতুন দিগন্ত খুলে দিল। তাই হস্টেলের বিশেষ কোনো ঘটনা যে আনন্দ দেয় তা বলতে পারি না।

কারো কথা বিশেষভাবে মনে পড়ে?

যে সব সাধু-মহারাজদের স্নেহ ভালবাসা পেয়ে এবং যে সব বন্ধুদের সাহচর্যে সাধু জীবনে প্রবেশের ইচ্ছা জেগেছিল তাঁদের সবার কথাই মনে পড়ে।

কোনো উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

মনে পড়ে আমাদেরই সঙ্গে পাঠরত এক বন্ধুর কলেজের সিঁড়িতে পা পিছলে গিয়ে অকাল মৃত্যু, যা মানুষের জীবনের অনিত্যতার স্মারক। আর মনে পড়ে আমাদের ভর্তির এক বছর পরেই, ১৯৬৬ সালে, কলেজের রজত জয়ন্তী উৎসব।

কোনো দুঃখ বেদনার স্মৃতি?

বন্ধুর মৃত্যু দুঃখজনক অবশ্যই। কিন্তু মানুষের মৃত্যু হবেই (আজ হোক, কাল হোক) এই চিন্তা দুঃখ বেদনার স্মৃতি হিসাবে মনে বিশেষ দাগ কাটে নি। দাগ কেটেছিল কিছু ছাত্রের মনুষ্যত্বের মৃত্যু দেখে। বিদ্যামন্দিরের সুন্দর পরিবেশে কিছুকাল অসুন্দরের নির্লজ্জ আত্মপ্রকাশের কথা এখনও মাঝে মাঝে মনে পড়ে। পূজনীয় অধ্যক্ষ মহারাজকে এবং উপাধ্যক্ষ মহারাজকে যে দিন প্রায় সারারাত ঘেরাও করে রেখে ঐ ছাত্ররা নানা কটূক্তি করে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন করেছিল— সে দিনটির দুঃখজনক স্মৃতি একটু পীড়া দেয়। অবশ্য স্বামীজির আশিসধন্য বিদ্যামন্দিরে বেশিদিন তারা টিকতে পারে নি।

বিদ্যামন্দির জীবনে প্রবেশ করে নিজেকে কিভাবে গড়তে চেয়েছিলেন?

প্রথম ক'মাসের চেষ্টা ছিল পরীক্ষার ফল খুব ভালো করে জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়া। তারপর এর থেকেও উচ্চতর আদর্শের সন্ধান পেয়ে তদনুসারে নিজেকে গড়তে চেয়েছিলাম। তার জন্য যা করণীয় তাই বেশি করে করার চেষ্টা করতাম।

আপনার সন্ন্যাস জীবনের অনুপ্রেরণা কি ছিল?

স্বামীজির যুব সম্প্রদায়ের প্রতি আহ্বান, যা তাঁর ইচ্ছা ও আশীর্বাদরূপে ফুটে উঠেছিল:

" শ্রদ্ধাবান হ, বীর্যবান হ, আত্মজ্ঞান লাভ কর আর পরহিতায় জীবন-পাত কর— এই আমার ইচ্ছা ও আশীর্বাদ।"

বিদ্যামন্দিরের সঙ্গে স্বামী তেজসানন্দজীর নাম ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। আপনারা তাঁকে পেয়েছিলেন। কেমন ছিলেন তিনি? তাঁকে পেয়ে আপনাদের কতটা লাভ হয়েছিল?

বিদ্যামন্দির তথা ছাত্রগত প্রাণ, শিশুসুলভ সরল, নিরভিমান, যাঁকে দেখলে আপনা-আপনি মাথা নত হয়— এমনি এক ব্যক্তি ছিলেন স্বামী তেজসানন্দ। ব্যক্তিত্বকে ভুলে স্বরূপত্বকে বোঝার চেষ্টায় রত ছিলেন বলেই এত পাণ্ডিত্য, এত ত্যাগ-তপস্যা, এত উচ্চপদ, এত সম্মান সত্ত্বেও তাঁর হাঁটুর বয়সী আমাদের সঙ্গে যখন কথা বলতেন, মনেই হত না যে উনি আমাদের ধরাছোঁয়ার বাইরে। আবার নিয়ম পালনে এতটুকু অমনোযোগ দেখলে যখন শাসন করতেন তখন ভয়ে বুক কাঁপত। তাঁকে পেয়ে তখন কতটা লাভ হয়েছিল ঠিক বলতে পারব না। এখন, জীবনের অনেকগুলো বছর পার হয়ে এসে, তাঁর জীবন আমার কাছে অনুপ্রেরণার উৎস।

আপনি এখন বেলুড়মঠের সন্ন্যাসীদের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের অধ্যক্ষ। কিভাবে তাঁদেরকে শিক্ষা দিচ্ছেন? তাঁদের শিক্ষাদান পদ্ধতি সম্বন্ধে কিছু বলুন।

শিক্ষা দিচ্ছি না। নবাগত (তিন বছর হয়েছে যাদের সংঘে আসা) ব্রহ্মচারী মহারাজদের সঙ্গে থাকি, তাঁদের সঙ্গে সনাতন শাস্ত্র, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-সাহিত্য পড়ি, আলোচনা করি। এতদিন গুরুজনদের কাছে যা শিখেছি, যা শুনেছি তাই তাঁদেরকে বলি। শিক্ষা দেওয়ার সামর্থ্য যাঁদের ছিল বা আছে তাঁদের কথা পরস্পর আলোচনা করি। তাতে আমরা উভয়েই উপকৃত হই।

আর শিক্ষাদান পদ্ধতি সম্বন্ধে বলি— মঠ-পরিচালকমণ্ডলী ব্রহ্মচারী মহারাজদের জন্য কিছু পাঠ্যবিষয় নির্ধারণ করে দিয়েছেন। সেগুলি এখানে তাঁরা পড়েন। তাঁদের দৈনন্দিন জীবনচর্যার জন্য একটি সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম আছে— জপ, ধ্যান, ভজন, সেবা, স্বাধ্যায় সব মিলিয়ে। সেটি যাতে তাঁরা অনুসরণ করেন, কোনো অসুবিধা হলে তা কীভাবে দূর করা যায়— এসব দেখাশোনা করার জন্য সন্ন্যাসী মহারাজরা এখানে থাকেন ও সেভাবে ব্রহ্মচারী মহারাজদের সাহায্য করেন।

ব্যক্তিত্ব বিকাশ, চরিত্রগঠন ও সর্বোপরি আদর্শ মানুষ গড়ার যে শিক্ষা স্বামীজির স্বপ্ন ছিল, রামকৃষ্ণ মিশন পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি সে ক্ষেত্রে কতখানি সফল?

অনেকখানি সফল। শতকরা একশ ভাগ সাফল্য না এলেও যতখানি এসেছে তা হতাশাব্যঞ্জক মোটেই নয়। আর শতকরা একশ ভাগ সফলতা

কখনই সম্ভব নয়। কারণ এই প্রতিষ্ঠানগুলো অনেক উঁচু আদর্শের। স্রোতের বিপরীতে সাঁতার কাটা তো!

মানুষ আজকাল অশান্ত, স্বার্থপর, অনুভূতিহীন হয়ে পড়েছে। সমাজ এক অবক্ষয়ের মুখে দাঁড়িয়ে আছে। কেন? এর শেষ কোথায়?

দীর্ঘকাল পরাধীনতার কুফলের জের তো এখনো কাটেনি। সময় লাগবে। শ্রীশ্রীমার একবার একটি দর্শন হয়েছিল— একটি বালিকার এক হাতে ঝাঁটা অন্য হাতে কলসি। মা জিজ্ঞাসা করায় বালিকা বলেন, প্রথমে ঝাঁট দিয়ে আবর্জনা মুক্ত করে কলসির অমৃত সর্বত্র তিনি ছিটিয়ে দেবেন।

এখন হয়তো সেই ঝাঁট দেওয়ার পালা চলছে। তাই সর্বত্র ধুলো উড়ছে, এটুকু সহ্য করতেই হবে। এই পর্যায় শেষ হলে অমৃত স্পর্শে সব সঞ্জীবিত হবে। শ্রীরামকৃষ্ণ-শ্রীশ্রীমা-স্বামীজি প্রমুখদের এই জন্যই আসা। একটু ধৈর্য ধরে এখন থাকতেই হবে।

সামাজিক, মানসিক, নৈতিক পরিবেশকে কিভাবে সুস্থ করা সম্ভব?

অন্ধকার ঘরে বসে 'উঃ কী অন্ধকার' বলে চীৎকার করলে তো অন্ধকার যাবে না। যার যতটুকু আলো আছে, সে ততটুকু আলো নিয়ে এলে অন্ধকার পালাবে। অবক্ষয় চলছে যাঁরা বুঝতে পারছেন তাঁরা সবাই যদি নিজের সাধ্যমতো আদর্শ জীবন যাপন করেন, তাহলেই অবক্ষয়ের অবসানের পথে একটু একটু করে এগিয়ে যাবে সমাজ। সেই যে ছোটোবেলায় পড়া কবিতা "Little drops of water and little grains of sand/Make the mighty ocean and pleasant land..." সার্থক হবে তখনই। অলৌকিক কোনো সমাধানের সন্ধান না করে আমাদের নিজেদের মধ্যে যে সম্ভাবনা আছে তাকে বিকশিত করার চেষ্টা করাই বুদ্ধিমানের কাজ নয় কি?

ছাত্র ও যুব সম্প্রদায়ের প্রতি আপনার আহ্বান কী?

১৮৯০ সালের ৫ই জানুয়ারি শ্রী যজ্ঞেশ্বর ভট্টাচার্যকে একটি চিঠিতে স্বামীজি লিখেছিলেন '...নিজে মানুষ হও, আর রাম প্রভৃতি যাহারা সাক্ষাৎ তোমার তত্ত্বাবধানে আছে, তাহাদিগকেও সাহসী, নীতিপরায়ণ ও সহানুভূতি সম্পন্ন করিবার চেষ্টা করিবে।...' স্বামীজির কথার প্রতিধ্বনি Be and make, নিজে ভালো হওয়ার চেষ্টা করা এবং সঙ্গে সঙ্গে যাদের উপর এতটুকু প্রভাব বা অধিকার আছে তাদের ভালো হতে সাহায্য করা।

যদি আপনি সমগ্র মানব সমাজের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের অধ্যক্ষ হতেন— তাহলে আপনার শিক্ষাদান পদ্ধতি কেমন হত বা কী হত?

যদিও তোমার 'যদি' অবান্তর তবুও বলি শ্রীভগবান আমাদের প্রতি কৃপা করে মানুষ হয়ে এসে আমাদেরই মতো জীবন যাপন করে দেখিয়ে দিয়ে গিয়েছেন আমাদের কী করা উচিত আর কী করা উচিত নয়। তিনি যে শিক্ষা দিয়েছেন, তাঁর জীবন ও বাণীর মাধ্যমে, তাই অনুসরণ করার চেষ্টা করলেই মানব জীবন ধন্য হবে, কৃত-কৃতার্থ হবে। সেই শুভবুদ্ধি আমাদের সকলের জাগুক, তাঁর শ্রীচরণে এই প্রার্থনা।

প্রাক্তনী সংসদের সপ্তদশ বার্ষিক সাধারণ সভা

তারিখ ও সময় : ১৫ অগস্ট ২০০৩, শুক্রবার, বিকেল ৩টে।

অন্যান্য নিয়মিত কাজকর্মের সঙ্গে এবারে আছে ২০০৩-২০০৬ এর জন্যে নতুন কর্মসমিতি নির্বাচন।

ঐদিন সকাল ১১টায় রাণী রাসমণি স্মারক বক্তৃতা বিবেকানন্দ সভাগৃহে।

বক্তা : অধ্যাপিকা জয়শ্রী মুখোপাধ্যায়, ইতিহাস বিভাগ, প্রেসিডেন্সী কলেজ।

বিষয় : ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের দেশপ্রেমে শ্রীশ্রীমায়ের প্রভাব।

বক্তৃতার অব্যবহিত পরেই মধ্যাহ্নভোজের ব্যবস্থা।

প্রাক্তনী সংসদের বার্ষিক প্রতিবেদন

ষোড়শ বার্ষিক অধিবেশন ২০০১-২০০২ রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির ১৫ অগস্ট ২০০২

তপনকুমার ঘোষ

প্রাক্তনী সংসদের ষোড়শ বার্ষিক সাধারণ সভায় সকলকে আন্তরিক স্বাগত জানাই। নতুন কর্মসমিতির এই দ্বিতীয় বার্ষিক সাধারণ সভায় বিগত আর্থিক বৎসরে সংসদের কাজকর্মের একটি সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন আপনাদের অবগতির জন্য উপস্থাপন করছি।

কর্মসমিতির সভা : আলোচ্য আর্থিক বছরে কর্মসমিতির দুটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সদস্য সংখ্যা : সংসদের বার্ষিক সদস্যসংখ্যা এখন ১৭ জন। তিনবছরের অধিককাল চাঁদা বাকি থাকলে সদস্যপদ খারিজের সাংবিধানিক সিদ্ধান্ত প্রয়োগ করার ফলে বার্ষিক সদস্য সংখ্যা কমে গেছে। আলোচ্য আর্থিক বছরে আজীবন সদস্যের সংখ্যা ৮২৫ জন। উল্লেখ্য, বিগত বার্ষিক সাধারণসভার সময়ে এই সংখ্যা ছিল ৭৫৮ জন। বিদায়ী তৃতীয় বর্ষের ছাত্রদের সংসদের সদস্যপদের অন্তর্ভুক্তি উদ্যোগ অনেকটাই সফল হয়েছে।

সংবিধান সংশোধন : পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে তাল রেখে চলার জন্যে সংসদের সংবিধানের কিছু পরিবর্তন জরুরী হয়ে পড়েছে। বিগত ১৫ অগস্ট ২০০১-এ এ বিষয়ে একটি বিশেষ সাধারণ সভা ডাকা হয়। কিন্তু তিন-চতুর্থাংশ সদস্যের উপস্থিতি না ঘটায় সংশোধন প্রস্তাব বাস্তবায়িত হয়নি। সেদিনকার সমবেত পরামর্শ মতো আমরা বিষয়টি নিয়ে আইনজ্ঞের পরামর্শ নিই। তাঁর নির্দেশমত আমরা লিখিত আকারে প্রস্তাবিত সংশোধন ডাকযোগে সকল প্রাক্তনীর কাছে পাঠিয়েছি। আমরা আশা করছি সদস্যদের লিখিত মতামত পাওয়া যাবে। বিশেষত 'কোরাম' সংক্রান্ত সাংবিধানিক ব্যবস্থা না পাল্টালে বার্ষিক সাধারণ সভার আয়োজন হয়তো আর সম্ভবই হবে না।

স্বামী বিমুক্তানন্দ ও স্বামী ধ্যানাত্মানন্দ স্মারক বৃত্তি : ২০০১-২০০২ শিক্ষাবর্ষের জন্য এই দুই বৃত্তি বাবদ মোট ৬০০০ টাকা বিদ্যামন্দির কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

বিবেকানন্দ সম্মেলন ও জাতীয় যুবদিবস : এ বছরের জাতীয় যুবদিবস উদ্‌যাপনের জন্য বেছে নেওয়া হয়েছিল উত্তর ২৪ পরগণা জেলাকে। ব্যবস্থাপনার সুবিধার জন্য সমগ্র জেলাকে ছয়টি অঞ্চলে ভাগ করে নিয়ে বিভিন্ন ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। আঞ্চলিক কমিটিগুলির পরিচালনায় জেলার ৩৬৪টি বিদ্যালয়ের মোট দ'হাজারের মতো ছাত্রছাত্রী বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, বারাসাত-এর তত্ত্বাবধানে ২৩ ডিসেম্বর ২০০১-এ বারাসাত রাষ্ট্রীয় বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে জেলাস্তরের প্রতিযোগিতাগুলি আয়োজিত হয়। প্রায় চারশোর মতো প্রতিযোগী এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন। ১৩ জানুয়ারি ২০০২-এ বেলঘরিয়া বিদ্যার্থী আশ্রমের সভাঘরে সমাপ্তি অনুষ্ঠানে জেলাস্তর প্রতিযোগিতায় সফল প্রতিযোগীদের পুরস্কৃত করা হয়। অনুষ্ঠানের শেষে আবৃত্তি পরিবেশন করেন বিদ্যামন্দিরের প্রাক্তনী বিশিষ্ট আবৃত্তিকার প্রদীপ ঘোষ, সংগীত পরিবেশন করেন আর এক প্রাক্তনী স্বামী অনিমেষানন্দ। প্রাক্তনী নিত্যনিরঞ্জন কুণ্ডু এবং সন্দীপন সেনের যুগ্ম সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় একটি অত্যন্ত সুদৃশ্য ও সুসম্পাদিত স্মারক পত্রিকা।

২০০৩-এর বিবেকানন্দ সম্মেলন ও জাতীয় যুবদিবস পালনের জন্য বেছে নেওয়া হয়েছে বাঁকুড়া জেলাকে। ইতোমধ্যেই রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, রামহরিপুরে একটি এবং বিদ্যামন্দিরে অপর একটি সভায় সম্মেলনের রূপরেখা তৈরি হয়ে গেছে।

স্বাস্থ্য প্রকল্প : ১৪ মে ২০০১-এ বেলুড়ের সাঁপুই পাড়ায় আমাদের নতুন স্বাস্থ্য প্রকল্প চালু হয়। বিগত দেড় বছর এই প্রকল্প নিয়মিত চলেছে। স্থানীয় চিকিৎসক ডাঃ অমিতাভ রায় বিনা পারিশ্রমিকে নিয়মিতভাবে প্রকল্পে চিকিৎসার দায়িত্ব অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করছেন। সংসদের পক্ষ থেকে ডাঃ রায়কে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। বিদ্যামন্দিরের চিকিৎসক-প্রাক্তনীদের প্রচেষ্টা এর সঙ্গে যুক্ত হলে বাসিন্দাদের অধিকতর চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়া সম্ভব হবে। রোগীদের প্রয়োজনীয় সমস্ত ওষুধ বিনামূল্যে দেওয়া হচ্ছে। স্থানীয় চিকিৎসক কেউ কেউ এবং আমাদের কোনো কোনো প্রাক্তনী ওষুধপত্র সংগ্রহে সাহায্য করেছেন। তবুও গড়ে মাসিক প্রায় ১৫০০ টাকার মতো ওষুধপত্র আমাদের কিনতে হচ্ছে। এই বাবদ স্থায়ী তহবিল তৈরী করতে অবিলম্বে ব্যবস্থা নেওয়া দরকার। অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে উল্লেখ করছি এই তহবিলে ১৯৪৮-৫০-এর প্রাক্তনী বিজয়ভূষণ রায় ৫০০০ (পাঁচ হাজার) টাকা দান করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। প্রসঙ্গত, গুজরাটে কর্মরত প্রাক্তনী শিবশঙ্কর বালার সক্রিয় উদ্যোগে বরোদার বিশিষ্ট ওষুধ প্রস্তুতকারক সংস্থা অ্যালেমবিক লিমিটেড থেকে নিয়মিতভাবে কিছু ওষুধ পাওয়ার বিষয়ে যোগাযোগ চলছে। আশা করি এই দৃষ্টান্তগুলি অন্যদের অনুপ্রাণিত করবে।

সংসদের আংশিক সময়ের কর্মী কৃষ্ণমোহন ঘোষ

চিরাচরিত আগ্রহ ও উৎসাহ নিয়ে প্রকল্পের কাজকর্ম দেখাশুনা করছেন।

প্রাক্তনীবার্তা : আলোচ্য আর্থিক বৎসরে 'প্রাক্তনীবার্তা'র কোনো সংখ্যাই প্রকাশিত হয় নি। পত্রিকাটি কিছু সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিল এবং আমরা সেগুলি সমাধানের চেষ্টা করেছি। আপনারা ইতোমধ্যেই জুন ২০০২ সংখ্যাটি হাতে পেয়ে গেছেন, আশা করি। 'প্রাক্তনীবার্তা'র জন্য পর্যাপ্ত লেখা পাওয়া যায় না, বিজ্ঞাপন অপ্রতুল, স্বেচ্ছাসেবক কর্মী নেই। এই পরিস্থিতিতে আপনাদের সক্রিয় সহযোগিতা দরকার। সর্বোপরি ডাকমাশুল অস্বাভাবিক বেড়ে যাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে 'প্রাক্তনীবার্তা' সদস্যদের হাতে পৌঁছে দেবার জন্য আমাদের অবশ্যই বিকল্পের সন্ধান করতে হবে।

স্মারক বক্তৃতা : সংসদের উদ্যোগে এবার দু'টি স্মারক বক্তৃতা আয়োজিত হয়েছে। বিগত বার্ষিক সাধারণ সভার দিনে (১৫.৮.২০০১) 'শ্রীশ্রীমায়ের জীবন ও বাণী' বিষয়ে রাণী রাসমণি স্মারক বক্তৃতাটি দিয়েছিলেন লেডি ব্রাবোর্ণ কলেজের বাংলা বিভাগের প্রাক্তন প্রধান অধ্যাপিকা শ্রীমতী বন্দিতা ভট্টাচার্য। আপনাদের পরামর্শমত এই বক্তৃতাটি আমরা 'প্রাক্তনীবার্তা'তে প্রকাশ করেছি। স্বামী তেজসানন্দ স্মারক বক্তৃতা আয়োজিত হয়েছিল গত ১ ডিসেম্বর ২০০১ তারিখে। 'ভারতীয় সংস্কৃতি ও সাহিত্য' শিরোনামে এই ভাষণ দেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান অধ্যাপক ড. বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়।

চন্দ্রনাথ দে এবং হেমচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় স্মারকবৃত্তি : বিদ্যামন্দিরের মেধাবী ও দুঃস্থ সদ্য-প্রাক্তনীদের জন্য নির্দিষ্ট এই দুটি এককালীন স্মারকবৃত্তি আমরা বিগত আর্থিক বৎসর থেকেই দিতে শুরু করেছি। এবছর এই দুটি বৃত্তি দেওয়া হয়েছে বিদায়ী তৃতীয় বর্ষের সচ্চিদানন্দ মাটিয়া এবং চন্দন বর্মনকে। আপনারা অবগত আছেন যে এই বাবদ আর্থিক সহায়তা করেছেন শ্রীমতী শ্রাবণী দে এবং ডা. ধীমান গঙ্গোপাধ্যায়।

আর্থিক সহায়তা : অন্যান্য বছরের মতো এই আর্থিক বছরেও বিদ্যামন্দিরের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান করণিক ধীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীকে মোট ১২০০ টাকা আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়েছে।

কৃতজ্ঞতা : বিদ্যামন্দিরের কর্তৃপক্ষ তথা এই প্রতিষ্ঠানের সার্বিক পরিকাঠামোগত ব্যবস্থার সহায়তা ছাড়া প্রাক্তনী সংসদের কাজকর্ম চালানো সম্ভব হত না। এ বিষয়ে বিদ্যামন্দির কর্তৃপক্ষ, সাধু-ব্রহ্মচারী, শিক্ষক, শিক্ষাকর্মীদের প্রতি আমাদের অকুণ্ঠ কৃতজ্ঞতা জানাই। অন্যান্য বছরের মতো এ বছরেও হিসাবপত্র বিনা পারিশ্রমিকে পরীক্ষা করছেন কলকাতার মনীষী কুমার দেব অ্যান্ড কোম্পানীর পক্ষে প্রাক্তনী মনোজ ভট্টাচার্য। কোষাধ্যক্ষ স্বপনকুমার চক্রবর্তী নানা অসুবিধার মধ্যেও দক্ষ হাতে হিসাবরক্ষার গুরু দায়িত্ব সামলেছেন। এঁদের সকলকে ধন্যবাদ জানাই।

প্রাক্তনী সংসদ দিনে দিনে বড়ো হচ্ছে এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রকট হচ্ছে এর কিছু সাংগঠনিক সমস্যা। আর্থিক সমস্যা ছাড়াও আমাদের মারাত্মক অসুবিধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে উৎসাহী কর্মীর অভাবে। সদস্যদের প্রত্যাশা অনেক— সে প্রত্যাশা পূরণ না হলে অনুযোগও ওঠে স্বাভাবিক ভাবে। এই পরিপ্রেক্ষিতে প্রাক্তনী সংসদের ক্রমবর্ধমান কাজকর্ম ঠিকমত চালাতে আপনাদের অধিকতর উৎসাহের সঙ্গে এগিয়ে আসবার আবেদন জানিয়ে প্রতিবেদন শেষ করছি।

পুনর্মিলন উৎসব : ২০০৪

দু'বছর পরে আবার পুনর্মিলনের ডাকে পুরানো সেই দিনের কথা, গানবাজনা, গল্প-গুজব এবং অবশ্যই মহাভোজ।

ফেব্রুয়ারির কোনো এক রবিবার এই অনুষ্ঠান। চিঠিতে তারিখ ও সময়সূচি জানানো হবে। সারাদিন সপরিবারে বিদ্যামন্দিরে আসুন। তৈরি হোন এখন থেকেই।

সেই সময় ও আমরা

দিব্যেন্দু নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বিদ্যামন্দিরে আমি ১৯৫৪ সালে ভর্তি হয়েছিলাম। স্মৃতিচারণ যতই পড়ছি ততই মোটামুটি একটা জিনিস পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে যে— স্বামী তেজসানন্দ মহারাজ প্রায় প্রত্যেককেই ভর্তির সময় ইংরেজিতে কিছু একটা লিখতে বলেছিলেন। তখন ইংরেজি অমৃতবাজারে ছোটোদের জন্য 'ইয়াং ফোকাস করনার' বলে রবিবার রবিবার পাতা বের হত আর তাতে প্রায়শই আমার লেখা বেরত— তাই শুনে মহারাজ খুবই খুশি হয়েছিলেন এবং আমাকেও ইংরেজিতে কিছু লিখতে বলেছিলেন। অবশ্যই ভর্তি হতে কোনো অসুবিধা হয়নি।

বিদ্যামন্দিরে আসার আগে আমি কলকাতার বাইরে মফঃস্বলের স্কুলেই পড়েছিলাম— স্কুল ফাইন্যাল পাশ করেছিলাম সিউড়ীর বীরভূম জেলা স্কুল থেকে। ১৯৫৪ সালে স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা শুরু হয়ে একবার প্রশ্নপত্র বার হয়ে যাবার জন্য বন্ধ হয়ে যায়, প্রায় মাস দু-এক পরে আবার হয়। স্বাভাবিব কারণেই ফল বের হতে দেরী হয়েছিল। সেই কারণে সেই বছর বিদ্যামন্দিরের সেশন শুরু হতেই কিঞ্চিৎ দেরী হয়েছিল।

আমি বিজ্ঞান নিয়ে ভর্তি হয়েছিলাম। স্থান হয়েছিল ওয়েস্ট হোস্টেলে। আমাদের হোস্টেল তারাপদ মহারাজের হাতে ছিল— তাঁর সহকারী অনিল মহারাজ। দুজনেই তখন ব্রহ্মচারী। হোস্টেলের মেস চালাতেন বলাই বাবু।

বাড়ির বাইরে থেকে পড়াশুনা করার অভিজ্ঞতা ওই প্রথম। তাই প্রথম প্রথম খুবই মন খারাপ লাগত। বিশেষ করে ভোর বেলা—অন্ধকার থাকতে যখন ঘন্টা বাজিয়ে জাগিয়ে দিত তখন তো কান্না পেত। ঘুম থেকে উঠে উপরে হলে প্রার্থনা গান— তারপর পড়া-প্রাতরাশ-স্নান। পরে ভাত খেয়ে কলেজে যাওয়া। হোস্টেল লাগোয়া মোটামুটি বড়ো পুকুর ছিল তাতে অনেকেই স্নান করতে যেত। কয়েকজন তো ওখানেই সাঁতার শিখে ফেলেছিল। আমি অবশ্য জলকে ভয় পেতাম বলে মোটেই পুকুরের দিকে যেতাম না।

কলেজে তখন পড়াশুনায় খুব একটা মন দিয়েছি বলে মনে হয় না। ফণীবাবু, যিনি অঙ্ক পড়াতেন, মাঝে মধ্যে ঘোষণা করে দিতেন যে উনি যা পড়াবেন তা অনেকেরই বোধগম্য হবে না— শুধু বিশেষ বিশেষ ছেলেদের জন্য। অতএব সেইদিন বেশি মাথা ঘামাবার দরকার হত না।

বিকেলে খেলার মাঠে অনেকে খেলাধুলা করত— তবে আমরা ক'জন প্রায় প্রাতিদিনই বেলুড় মঠে মায়ের মন্দিরের সামনে গঙ্গার ঘাটে বসে সময় কাটাতাম। কখনো কখনো মোড়ের মাথার দোকানে কাটলেট খেতাম বা আর একটু এগিয়ে বাজারের কাছে মিষ্টি, ভেজিটেবল চপ আর ছানার পায়েস খেতাম। ওখানে একটা লন্ড্রীতে জামাকাপড় কাচতে দিতেও যেতে হত।

তখন আমাদের আরো দুটো হোস্টেল ছিল— ইস্ট হোস্টেল যেটা ওয়েস্ট হোস্টেলের গায়েই এবং সাউথ হোস্টেল যেটা শহরের মধ্যে ছিল। এই তিন হোস্টেলের মধ্যে খুবই রেশারেশি ছিল সব ব্যাপারে— পড়াশুনায় ফল, খেলায়। সাউথ হোস্টেলের ছাত্ররা অবশ্য আমরা বিদ্যামন্দিরে পড়াকালীনই ওয়েস্ট হোস্টেলে চলে এসেছিল। ওয়েস্ট হোস্টেলে এক দিকে দুটো অতিরিক্ত তলা তৈরী হবার পরে।

বেলুড়ে আমাদের কজনের খুব আগ্রহের বিষয় ছিল সংগীত শেখার আসর। সন্ধ্যা বেলায় হত। কয়েকজন তো খুব ভাল গাইত— যেমন নীলকমল সেনগুপ্ত, পুষ্পেন্দুসুন্দর মুখার্জী, আমাদের আগের ব্যাচের রেবন্তদা। যখন কোনো প্রতিযোগিতা হত— পুরস্কার এদের মধ্যেই যেত। গানের ক্লাস খুব গম্ভীরভাবে হত— সরগম, তাল ইত্যাদি সবকিছুর উপর শিক্ষা দেওয়া হত। সেইসবের কিছু কিছু এখনও মনে আছে। গানের লিখিত এবং প্রাকটিকাল পরীক্ষা নেওয়া হত। আমাদের ব্যাচের বিশেষ করে আমাদের হোস্টেলের অনেক ছাত্রই খুব নাম করেছিল। যেমন আনন্দমোহন চক্রবর্তী, রামগোপাল আগরওয়াল (ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্ক), মানস চন্দ (ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব মাইনস্), পার্থসারথি চৌধুরী (আই.এ.এস), শ্যামল বসু ইত্যাদি।

আগেই বলেছি পড়াশুনায় আমাদের খুব মন ছিল না। প্রচুর গল্প আড্ডা হত। দু'সপ্তাহে একবার ফাঁকি দিয়ে সালকিয়ায় পারিজাত বা অশোকা বা বালীতে গিয়ে সিনেমা দেখতাম। ধরাও এক দুবার পড়েছি। তারাপদ মহারাজ এবং অনিল মহারাজ প্রচুর ধমকাতেন— মাঝে মাঝে বলতেন বাড়ি পাঠিয়ে দেবেন। ভয় পেতাম— কয়েকদিন আবার খুব ভালোভাবে থাকতাম।

তবে অত বকাবকি করলেও তারাপদ মহারাজের ভালবাসার পরিচয় পেয়েছিলাম। তখন আমার সেকেন্ড ইয়ার— হঠাৎ করে খুব জ্বরে পড়েছিলাম। একদিন দুপুরে হোস্টেল খালি— সবাই কলেজে। একা জ্বরে কাহিল। আচ্ছন্ন অবস্থায় বুঝলাম তারাপদ মহারাজ আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন। সেই

স্মৃতি আজও আমায় মাঝে মাঝে দোলা দিয়ে যায়।

আমাদের দুবছরে একটা খুবই আকর্ষক ব্যাপার হয়েছিল, আমরা যখন দ্বিতীয় বর্ষে তখন প্রথম বর্ষে ভর্তি হয়েছিল বিশ্বজিৎ চ্যাটার্জী। সারাক্ষণই শরীর চর্চা এবং এসেই বিদ্যামন্দিরের বাৎসরিক নাটকে অংশ নেওয়াই তখন ওর কাছে কিছুদিন প্রধান ব্যাপার হয়ে গেল। আমাদের হোস্টেল থেকে সেই বছর আমাদের প্রায় জনা চল্লিশেক ছেলেকে দুর্গাপুরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। শেষ রাত্রে ট্রেন দুর্গাপুরে পৌঁছলে আমরা স্টেশনের প্ল্যাটফর্মেই শুয়ে বসে রইলাম। তখন দুর্গাপুর স্টেশন প্ল্যাটফর্ম বাঁধানোও ছিল না। সেই রাত্রে স্টেশনে বিশ্বজিৎ গান করেছিল— 'এই তারা ভরা কালো রাতে'। সুন্দর গানের গলা ছিল আর ঐ পরিবেশে গানটা খুবই ভালো লেগেছিল।

বিদ্যামন্দিরের অনেক কথাই মনে আসে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ভ্রাতৃবরণ অনুষ্ঠান। অন্য জায়গায় যেটা 'র‍্যাগিং'— সেটা বিদ্যামন্দিরে কি সুন্দর পরিবেশে নতুন আগন্তুক ছাত্রদের বড়োরা স্বাগতম জানাত সেটা একটা শেখবার মতো ব্যাপার। আশাকরি সেই পুরোনো অনুষ্ঠান আজও চালু আছে এবং এটা বহুল প্রচার হওয়া উচিত যাতে অন্যরা এর অনুসরণ করতে পারে।

বিদ্যামন্দির ছেড়ে আসার পর যোগাযোগ অনেক কমে গেছে। তবে এখনও শ্রী গোকুলানন্দজী মহারাজ কলকাতায় এলে যোগাযোগ করেন, মিলিত হন। তখন আমরা আমাদের সৌভাগ্যবান মনে করি। এ প্রসঙ্গে বলা উচিত যে আমরা যখন বিদ্যামন্দিরে শ্রী গোকুলানন্দজী মহারাজ তখন ব্রহ্মচারী গোবিন্দ মহারাজ—ইস্ট হোস্টেলে থাকতেন এবং আমাদের ইংরেজি পড়াতেন। যখন শ্রদ্ধেয় মহারাজ আমাদের ডাকেন তখন অনেকের সঙ্গে দেখা হয়— পুরনো অনেক কথা মনে পড়ে যায়। মনে পড়ে যায় বেলুড়ের সেই দু' বছরের কথা— যা সব বলতে গেলে এই প্রাক্তনীবার্তার কয়েকটা সংখ্যার পাতা ভরে যাবে।

বিবেকানন্দ সম্মেলন ও জাতীয় যুবদিবস উদযাপন (২০০২-২০০৩)

বিবেকানন্দ সম্মেলনের জন্যে এবারে বেছে নেওয়া হয়েছিল শ্রীশ্রী মায়ের পুণ্যস্মৃতি বিজড়িত বাঁকুড়া জেলাকে। এর আগে আটটি জেলায় সফল ভাবে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। শুরুতে প্রাক্তনী সংসদের একক উদ্যোগে 'স্বামীজী দিবস' শিরোনামে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হত। পরবর্তীকালে অনুষ্ঠানের বহর বেড়ে যাওয়ায় বিদ্যামন্দির ও প্রাক্তনীসংসদের যৌথ উদ্যোগে সম্মেলন আয়োজিত হচ্ছে। সহযোগিতা নেওয়া হচ্ছে সংশ্লিষ্ট জেলার রামকৃষ্ণ মঠ মিশনের শাখাকেন্দ্র এবং রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ ভাবপ্রচার পরিষদের কাছে থেকেও। কেন্দ্রীয় সরকারের মানবসম্পদ উন্নয়ন দপ্তর থেকে ৯৮-৯৯ থেকে বিদ্যামন্দির এই বাবদ প্রতিবছর এক লক্ষ টাকা আর্থিক অনুদানও পাচ্ছে। সব মিলিয়ে সাম্প্রতিক অতীতের বিবেকানন্দ সম্মেলন সংশ্লিষ্ট জেলাগুলিতে ব্যাপক সাড়া জাগাতে সক্ষম হয়েছে।

এবারে সম্মেলনের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্যে বাঁকুড়া জেলাকে অমরকানন, বাঁকুড়া, জয়রামবাটি, খাতড়া, সারেঙ্গা ও সোনামুখী— এই ছটি অঞ্চলে ভাগ করা হয়। আঞ্চলিক স্তরের সফল ছাত্রছাত্রীরা নানা ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত পর্বে অংশগ্রহণ করে রামহরিপুর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে বিগত ২২ ডিসেম্বর ২০০২ তারিখে। ৩০০টি স্কুলের প্রায় সাড়ে তিনহাজার ছাত্রছাত্রী এই সম্মেলনে সামিল হয়। ১৯ জানুয়ারি ২০০৩ তারিখে বাঁকুড়া আশ্রমে আয়োজিত অনুষ্ঠানে জেলাস্তরে প্রতিযোগিতায় সফল ছাত্রছাত্রীদের পুরস্কার এবং শংসাপত্র প্রদান করা হয়। এই অনুষ্ঠানে বিভিন্ন বক্তা শ্রীশ্রীঠাকুর , মা এবং স্বামীজীর আদর্শ ও কর্মধারা বিষয়ে বক্তব্য রাখেন। এ ছাড়া ছাত্রছাত্রীদের নানান জিজ্ঞাসার সাপেক্ষে একটি প্রশ্নোত্তরের অনুষ্ঠানও আয়োজিত হয়। প্রাক্তনী ডাঃ ধীমান গাঙ্গুলী এই পর্ব পরিচালনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আরো অনেক প্রাক্তনী। সম্মেলন উপলক্ষে একটি সুসম্পাদিত স্মারকপত্রিকা প্রকাশ করা হয়। এই পত্রিকায় দিব্যজীবন ও বাণী, স্মরণীয় ও বরণীয় ব্যক্তিত্ব, জেলার নানা ঐতিহ্য এবং আরো অনেক প্রয়োজনীয় তথ্যাবলী মুদ্রিত হয়। প্রাক্তনী সংসদের সদস্য সন্দীপ সেনের সুযোগ্য সম্পাদনায় প্রকাশিত এই পত্রিকাটি প্রশংসিত হয়েছে।

এবারেই প্রথম বাঁকুড়া জেলার শিক্ষক প্রতিনিধিদের বিশেষ অনুরোধে ১ মে ২০০৩-এ বিদ্যামন্দিরের বিবেকানন্দ সভাগৃহে অনুষ্ঠিত হল একটি শিক্ষক সম্মেলন। জেলার দূরদূরান্ত থেকে আগত প্রায় দেড়শ শিক্ষকশিক্ষিকা বর্তমান শিক্ষা সমস্যা এবং স্বামীজীর শিক্ষাচিন্তার বিভিন্ন দিক নিয়ে অত্যন্ত কার্যকর আলোচনা করেন এবং পারস্পরিক মত বিনিময় করেন। এবারের বিবেকানন্দ সম্মেলনে এভাবে এক নতুন মাত্রা সংযোজিত হল।

বিদ্যামন্দির সমাচার ২০০২-২০০৩

বিগত শিক্ষাবর্ষে বিদ্যামন্দিরের প্রতিবেদন শুরু করেছি কিছু যাওয়া আসার সংবাদ দিয়ে। কালের অমোঘ নিয়মে বিদ্যামন্দির ছেড়ে চলে গেছেন অনেকে। প্রকৃতির নিয়মে সেই শূন্যস্থান পূরণ করতে এসেছে নতুন মানুষ। সাধু-ব্রহ্মচারীদের মধ্যে বেলুড় মঠের ব্রহ্মচারী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে চলে গেলেন ব্রহ্মচারী পলাশ মহারাজ। ব্রহ্মচর্য থেকে সন্ন্যাসে উন্নীত হয়ে বেলুড়মঠে বৃহত্তর দায়িত্ব নিয়ে চলে গেলেন সকলের প্রিয় দেবজ্যোতি (স্বামী দেবত্বানন্দ) মহারাজ। এখন তিনি আছেন বেলুড় মঠের ত্রাণ ও পুনর্বাসন বিভাগে। ব্রহ্মচারী রবিকুমার মহারাজ চলে গেলেন বেলুড়মঠের ব্রহ্মচারী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে। শূন্যস্থান পূরণ করতে বিদ্যামন্দির পরিবারে যোগ দিলেন স্বামী পরেশাত্মানন্দজী (সুদীপ্ত মহারাজ) এবং স্বামী অরুণাত্মানন্দজী (সৌমেন মহারাজ)।

অধ্যাপকদের মধ্যে স্বেচ্ছা-অবসর নিলেন দর্শনের বিভাগীয় প্রধান তাপসকুমার মুখোপাধ্যায়। এখন বিভাগীয় প্রধানের দায়িত্ব পড়েছে তরুণ অধ্যাপক ফরিদ-উর-রহমানের উপর। দীর্ঘ ৩৮ বৎসর অধ্যাপক হিসেবে বিদ্যামন্দিরের সেবা করে অবসর নিলেন রসায়নের বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক তরুণ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। রসায়ন বিভাগের অভিভাবকত্ব এখন ড. রবীন্দ্রনাথ ধাড়ার উপর। অবসর নিলেন রসায়নবিদ্যা বিভাগে ল্যাবরেটরি ইন্‌স্ট্রাকটর রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়— বিদ্যামন্দিরের সঙ্গে তাঁর সংযোগও প্রায় দীর্ঘ চারটি দশকের। এ ছাড়া বিদ্যামন্দিরের বাংলা বিভাগে স্বল্প সময়ের জন্য অধ্যাপনা করে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার দায়িত্ব নিয়ে চলে গেলেন অধ্যাপক শাশ্বত ভট্টাচার্য।

শূন্যপদ পূরণের জন্যে যোগ দিয়েছেন বেশ কয়েকজন তরুণ অধ্যাপক। অর্থনীতি বিভাগে যোগ দিয়েছেন অধ্যাপক অর্ণব কাঞ্জিলাল এবং অধ্যাপক দেবকুমার চক্রবর্তী। বাংলা বিভাগে যোগ দিয়েছেন অধ্যাপক দীপঙ্কর মল্লিক। ইতিহাস, সংস্কৃত এবং দর্শন বিভাগের শূন্যপদ পূরণের চেষ্টা চলছে। আশা করা যায়, অনতিবিলম্বে বিদ্যামন্দিরের স্টাফরুমে আরো কিছু নতুন মুখ দেখা যাবে।

অবসর তালিকায় শেষতম সংযোজন — বিদ্যামন্দিরের গ্রন্থাগারিক রমিত বসুর নাম। বিগত ৩১ মার্চ ২০০৩ তারিখে তাঁর অবসর গ্রহণ বিদ্যামন্দিরের গ্রন্থাগারে বিরাট শূন্যতার সৃষ্টি করল— যা আপাতত অপূরণীয়। এখন গ্রন্থাগারের পূর্ণ দায়িত্ব আশিস চট্টোপাধ্যায়ের উপর।

২০০৩-২০০৪ শিক্ষা বর্ষে বিদ্যামন্দিরের শিক্ষাসংসদের সম্পাদকের দায়িত্ব নিয়েছেন প্রাক্তনী সংসদের কোষাধ্যক্ষ ড. স্বপনকুমার চক্রবর্তী। তিনি অধ্যাপক মতিশংকর চট্টোপাধ্যায়ের স্থলাভিষিক্ত হলেন।

বিদ্যামন্দিরের প্রাত্যহিক জীবন যাপনে উৎসব অনুষ্ঠানের নিত্য আনাগোনা। নিয়মিত উৎসবগুলিকে ছেড়ে দিলেও একটি বিশেষ অনুষ্ঠানের কথা উল্লেখ করতেই হয়। বিদ্যামন্দিরের হীরকজয়ন্তী উৎসবের সমাপ্তি ঘটল বিগত ৪ জুলাই ২০০২এ। এই অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে আসেন সস্ত্রীক পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় রাজ্যপাল শ্রী বীরেন জে. শাহ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সাধারণ সম্পাদক স্বামী স্মরণানন্দজী মহারাজ। ঐদিন ইন্ডিয়ান এপিক কালচার সেন্টার, কলকাতার পক্ষ থেকে বিদ্যামন্দির কর্তৃপক্ষের হাতে 'বিশ্বনায়ক বিবেকানন্দ এপিক পুরস্কার ২০০২' তুলে দেওয়া হয়। সন্ধ্যায় ঐ সংস্থার পক্ষ থেকে স্বামী বিবেকানন্দর উপর একটি যোগনাটিকা পরিবেশিত হয়।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে ইয়ুথ পার্লামেন্ট প্রতিযোগিতা আয়োজিত হয় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পরিচালনায়। আঞ্চলিক স্তরের প্রতিযোগিতায় বিদ্যামন্দিরের টিম প্রথম স্থান অধিকার করে। এই প্রতিযোগিতার রাজ্যস্তরে বিদ্যামন্দিরের ছাত্ররা দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে বিশেষ কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখে। এ ছাড়াও বিভিন্ন আন্তঃ কলেজ ও অন্যান্য সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় বিদ্যামন্দিরের ছাত্রেরা তাদের সাফল্যের ধারা অক্ষুণ্ণ রাখতে পেরেছে।

বিদ্যামন্দিরের শনিবারের সেমিনার ক্লাসে আমরা যে সমস্ত বিশিষ্ট বক্তাদের পেয়েছি তাঁদের একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা নীচে দেওয়া হল।

বক্তার নাম : অধ্যাপক অরিন্দম চক্রবর্তী
পরিচয় : দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক,
হাওয়াই বিশ্ববিদ্যালয়, আমেরিকা
বিষয় : ওনারলেস ইমোশন : ফ্রম ইসথেটিকস টু স্পিরিচুয়াল সাইকোলজি
তারিখ : ৯ জুলাই ২০০২

বক্তার নাম : স্বামী জ্যোতিরূপানন্দ
পরিচয় : অধ্যক্ষ, বেদান্ত সোসাইটি, মস্কো, রাশিয়া
বিষয় : রাশিয়ায় রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আন্দোলন
তারিখ : ৭ অগস্ট ২০০২

বক্তার নাম : অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসু
(রানী রাসমণি স্মারক বক্তৃতা)

পরিচয় : বিশিষ্ট গবেষক এবং প্রাক্তন অধ্যাপক, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
বিষয় : ভগিনী নিবেদিতার জীবন ও সাধনা
তারিখ : ১৫ অগস্ট ২০০২

বক্তার নাম : কল্যাণ মুখোপাধ্যায়
পরিচয় : অধ্যাপক, বসুবিজ্ঞান মন্দির, কলকাতা
বিষয় : অ্যাপলিকেশন অব স্ক্যানিং ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপি ইন প্ল্যান্টস
তারিখ : ১ সেপ্টেম্বর ২০০২

বক্তার নাম : অধ্যাপক তপন রায়চৌধুরী
পরিচয় : ঐতিহাসিক
বিষয় : রিলিজিয়নস্ সেনসিবিলিটি অব মডার্ন বেঙ্গলিস
তারিখ : ৭ সেপ্টেম্বর ২০০২

বক্তার নাম : সিদ্ধার্থ গুহরায়
পরিচয় : অধ্যাপক, বিবেকানন্দ কলেজ, ঠাকুরপুকুর

বক্তার নাম : গৌতম বসু
পরিচয় : অধ্যাপক, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়
বিষয় : কাশ্মীর সমস্যার উৎস সন্ধানে
তারিখ : ১৪ সেপ্টেম্বর ২০০২

বক্তার নাম : ডা. অমিয়কুমার হাটি
পরিচয় : প্রাক্তনী, বিশিষ্ট চিকিৎসাবিজ্ঞানী
বিষয় : জনস্বাস্থ্য
তারিখ : ২৫ সেপ্টেম্বর ২০০২

বক্তার নাম : গৌরী ধর্মপাল (স্বামী তেজসানন্দ স্মারক বক্তৃতা)
পরিচয় : অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপিকা এবং বিশিষ্ট সাহিত্যিক
বিষয় : বৈদিক ঋষিদের ভাব, ভাষা ও কাল
তারিখ : ২৮ সেপ্টেম্বের ২০০২

বক্তার নাম : স্বামী মেধসানন্দ (অম্বিকা সরকার ও যদুনাথ মজুমদার স্মারক বক্তৃতা)
পরিচয় : প্রাক্তন অধ্যক্ষ, বিদ্যামন্দির; বর্তমান অধ্যক্ষ, বেদান্ত সোসাইটি, জাপান
বিষয় : ভারত সংস্কৃতির কেন্দ্র বারানসী
তারিখ : ৯ নভেম্বর ২০০২

বক্তার নাম : অধ্যাপক দেবাশিস মুখোপাধ্যায়
পরিচয় : ডিরেক্টর, ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য কালটিভেশন অব সায়েন্স

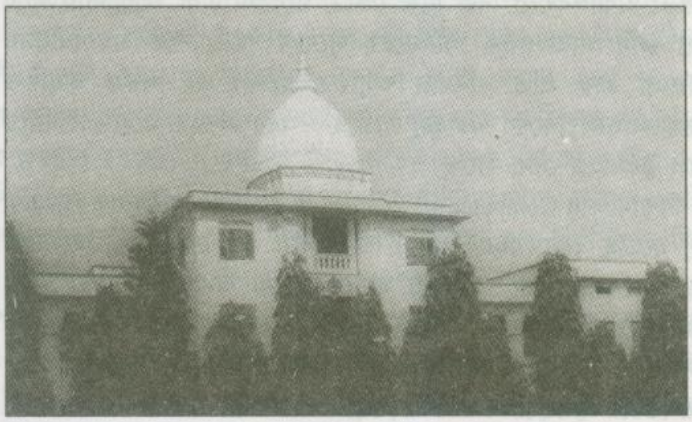

বিষয় : কেমিস্ট্রি এট দ্য টার্ন অব দ্য সেঞ্চুরি
তারিখ : ২৩ নভেম্বর ২০০২
বক্তার নাম : অধ্যাপক বিশ্বজিৎ মাইতি
পরিচয় : নর্থ ওয়েস্টার্ন ইউনিভার্সিটি, ইভেনস্টন, ইলিনইস, শিকাগো
বিষয় : স্কোপ অব হায়ার স্টাডিজ ইন কেমিস্ট্রি
তারিখ : ১২ ডিসেম্বর ২০০২

বক্তার নাম : কৌশিক বসু
পরিচয় : অধ্যাপক, করনেল ইউনিভার্সিটি
বিষয় : গেম থিয়োরি
তারিখ : ২৯ ডিসেম্বর ২০০২

বক্তার নাম : অধ্যাপক সি.এন.আর.রাও
পরিচয় : এফ. আর. এস. ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব সাইন্স, ব্যাঙ্গালোর
বিষয় : একসাইটমেন্ট অব কেমিস্ট্রি
তারিখ : ৯ জানুয়ারি ২০০৩

বক্তার নাম : অধ্যাপক রামগোপাল আগরওয়ালা
পরিচয় : প্রাক্তনী, বিশ্বব্যাঙ্কের অবসরপ্রাপ্ত উপদেষ্টা
বিষয় : মেইনস্ট্রিমিং স্পিরিচুয়ালিটি ইনটু ডেভলপমেন্ট
তারিখ : ১৬ জানুয়ারি ২০০৩

এছাড়া 'নতুন শতাব্দীতে স্বামীজীর অর্থনৈতিক চিন্তার প্রাসঙ্গিকতা' বিষয়ে বিদ্যামন্দির ও বঙ্গীয় অর্থনীতি পরিষদের যৌথ ব্যবস্থাপনায় সারাদিনব্যাপী এক জাতীয় স্তরের আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হয় ২১ সেপ্টেম্বর ২০০২ তারিখে।

বিদ্যামন্দিরের পঠনপাঠন তথা সামগ্রিক বিদ্যাচর্চার পরিবেশ উন্নত করার ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন ১৫ মে ২০০২ তারিখে অনুষ্ঠিত শিক্ষকদের বিনিময় কর্মশালা। রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অন্যতম সহসম্পাকদক স্বামী ভজনানন্দজী এই উদ্যোগের আনুষ্ঠানিক উদ্‌বোধন

করেন। অধ্যাপকদের নিজ নিজ ক্ষেত্রে গবেষণা এবং বিদ্যাচর্চার সূত্রে প্রাপ্ত জ্ঞান পারস্পরিক বিনিময়ের সুযোগ করে দিতে এই বিনিময় কর্মশালা প্রায় প্রতি শনিবার অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এই পর্যন্ত অনুষ্ঠিত আলোচনাগুলি বিশেষ ফলপ্রসূ হয়েছে—অধ্যাপকদের মধ্যে এই নিয়ে প্রবল উৎসাহও দেখা যাচ্ছে।

বিদ্যামন্দিরে Computer application -এ ত্রিবার্ষিক বৃত্তিমূলক পাঠক্রম চালু হয়েছে কয়েকবছর আগে। দিনে দিনে এই কোর্সটির জনপ্রিয়তা বাড়ছে। বিদ্যামন্দিরের অন্যান্য ছাত্রদের মধ্যে কমপিউটার সচেতনতা বৃদ্ধির জন্যে একটি পৃথক ল্যাবরেটরী স্থাপিত হয়েছে মূলত স্থানীয় সাংসদ স্বদেশরঞ্জন চক্রবর্তীর অর্থানুকূল্যে (MPLADS)। এর ফলে ছাত্রদের কমপিউটার ব্যবহারে দক্ষতা বাড়ছে।

ইংরেজি ও সংস্কৃত বাচনক্ষমতা অর্জনের জন্যে বিদ্যামন্দিরে কথ্য ইংরেজি ও সংস্কৃতের কোর্স চালু হয়েছে। স্পোকেন ইংরেজি নিয়ে ছাত্রদের মধ্যে আগ্রহ স্বাভাবিক পেশাগত তাগিদে। অন্যদিকে কথ্য সংস্কৃত শিক্ষার উদ্যোগ এসেছে ইউ.জি.সির পক্ষ থেকে—ছাত্রেরা এই কোর্সেও সোৎসাহে অংশগ্রহণ করছে।

এই সমস্ত প্রচেষ্টার ফলশ্রুতিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাতে বিদ্যামন্দিরের ছাত্রদের সাফল্য অপ্রতিহত। সংক্ষেপে ২০০২ এর উচ্চমাধ্যমিক এবং বি.এ/ বি.এস.সি পরীক্ষার ফল নীচে দেওয়া হল।

উচ্চ মাধ্যমিক : ২০০২	পরীক্ষার্থী	প্রথম বিভাগ	দ্বিতীয় বিভাগ	৮০% এর উপর	৭৫ %এর উপর	সর্বোচ্চ নম্বর
বিজ্ঞান বিভাগ	৬২	৬০	১	৩১	৪৫	৮৮৫
কলা বিভাগ	১৭	১৪	২	২	৪	৮৫০

পার্ট টু পরীক্ষায় (বি.এ/বি.এস.সি) মোট ৯৪ জন ছাত্রের মধ্যে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছে ৩৩ জন। বিভিন্ন অনার্সে প্রাপ্ত সর্বোচ্চ নম্বর এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থান সংক্ষেপে নীচে দেয়া হল।

গণিত	৮৬.৮৮%	প্রথম
পদার্থবিদ্যা	৭০.৮৮%	সপ্তম
রসায়ন	৭৪.১৩%	ষষ্ঠ
অর্থনীতি	৬৫.৩৮%	ত্রয়োদশ
রাষ্ট্রবিজ্ঞান	৪৪%	—
ইতিহাস	৫০.৮৮%	—
দর্শন	৬৬.২৫%	চতুর্থ
সংস্কৃত	৫৬.৮৮%	সপ্তদশ
ইংরেজি	৫৬.১৩%	বিংশতি

২০০২ এর বি.এ/বি.এস.সি. পার্ট টু পরীক্ষার ফলাফলে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য গণিত বিভাগের ছাত্র শিবানন্দ বিশ্বাসের কৃতিত্ব। সে রেকর্ড নম্বর পেয়ে প্রথম শ্রেণীতে প্রথমই কেবল হয় নি— এ বছরের পরীক্ষার্থীদের মধ্যে (সকল বিষয়ের) সর্বোচ্চ নম্বর পেয়ে "এডওয়ার্ড স্কলার"ও হয়েছে। রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন প্রদত্ত "হিউম্যান একসেলেন্স অ্যাওয়ার্ড"ও সে পেয়েছে।

২০০২ এর পার্ট ওয়ান পরীক্ষার ফলও খুবই সন্তোষজনক হয়েছে। পদার্থবিদ্যার মোট ২৫ জনের মধ্যে ১৯ জনই ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছে। রসায়নে মোট ২৫ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৯ জন এবং গণিতবিভাগে ১২ জনের মধ্যে ১১ জনই ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছে। শুরু থেকেই বি. এসসি ভোকেশানাল কোর্সে ফলাফল ভালো হচ্ছে এবং উত্তীর্ণ হবার পর বেশিরভাগ ছাত্রই কোথাও না কোথাও কাজকর্ম পেয়ে যাচ্ছে।

২২.১.২০০৩-এ বিদ্যামন্দিরের বার্ষিক ক্রীড়াপ্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। এবারে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করলেন বিশিষ্ট অলিম্পিয়ান হকি খেলোয়াড় কেশব দত্ত মহাশয়। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আর একজন অলিম্পিয়ান— অতীত দিনের দিকপাল ফুটবলার সাউ মেওয়ালাল। গত কয়েক বছরের মতো এবারেও বিদ্যামন্দিরে আয়োজিত হয়েছে জেলা ও আঞ্চলিক স্তরে আন্তঃ বেসরকারি কলেজ ফুটবল চ্যাম্পিয়ানশিপ। জেলাস্তরের আন্তঃ বেসরকারি অ্যাথলেটিক মিট-ও অনুষ্ঠিত হল বিদ্যামন্দিরের মাঠে— বিদ্যামন্দিরের পরিচালনায়।

এইভাবে বিদ্যামন্দির ঐতিহ্য এবং আধুনিকতার মধ্যে সমন্বয় সাধন করে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে তার গৌরবোজ্জ্বল অস্তিত্বকে সদাজাগ্রত রাখার চেষ্টা অব্যাহত রেখে চলেছে।

এবার উচ্চমাধ্যমিকে বিদ্যামন্দির থেকে বিজ্ঞানে সর্বোচ্চ নম্বর পেল সৌভিক রায় এবং কলা বিভাগে পার্থজিৎ কয়াল। তাদের প্রাপ্ত নম্বর যথাক্রমে ৯২৬ এবং ৭৭২। সৌভিক ও পার্থজিৎকে অভিনন্দন।

ফলাফলের বিস্তারিত সংবাদ ২১ পাতায়

অন্তেবাসী-রাষ্ট্র, আইন ও মানবাধিকার

বীরেশ্বর রায়

অন্তেবাসী বা মূল স্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন মানুষের সম্পর্কে ধ্যান ধারণা, সমাজের বিবর্তনের সঙ্গে বদলাচ্ছে। সাধারণভাবে অন্তেবাসী তারাই যারা অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক বা অন্যান্য কোনো কারণে সমাজের মূল পরিধির বাইরে অবস্থান করছে; সমাজের মূল মানুষদের সঙ্গে পা মিলিয়ে চলতে গিয়ে পিছিয়ে পড়েছে এবং সামাজিক জীবনের সুযোগ সুবিধাগুলি যারা সমাজের অন্যান্য স্তরের মানুষের সঙ্গে সমভাবে ভোগ করার সুযোগ পায় না। সমাজের মূল স্রোত এর যথার্থ সংজ্ঞা দেওয়া খুব কঠিন। মূল স্রোত যে সব সময় সংখ্যাগরিষ্ঠদের নিয়ে গঠিত হবে একথা ঠিক নয়। তবে সাধারণভাবে এ কথা বলা যেতে পারে যে সমাজে দীর্ঘ দিন ধরে যে সামাজিক শ্রেণী, ভাষাভাষী গোষ্ঠী বা ধর্মীয় গোষ্ঠী প্রাধান্য বজায় রেখে চলে তাদের আমরা মূল স্রোত বলে চিহ্নিত করতে পারি। ভারতবর্ষের জনসমাজকে মূলস্রোত ও অন্তেবাসী বা উপধারায় বিভক্ত করা যায়। ভারতীয় জনসমাজ মূলত অসমগোত্রীয় (Heterogenus) সমগোত্রীয় (Homogenus) নয়। এই কারণে ভারতীয় জনসমাজের গঠন অত্যন্ত জটিল এবং বহু স্রোত বা গোষ্ঠির মধ্যে কোনটি মূলস্রোত, সেটি নির্ধারণ করা সহজসাধ্য নয়। তবু সামাজিক অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যগুলির ভিত্তিতে সমাজের মূল স্রোত এবং অন্তেবাসী বা উপধারাগুলিকে চিহ্নিত করা সম্ভব। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে সমাজের মূলস্রোত কোনো শাশ্বত বা অপরিবর্তনীয় ধারণা নয়। সামাজিক পরিবর্তনের পটভূমিতে মূলস্রোত এবং অন্তেবাসী সম্পর্কিত ধারণাও পরিবর্তন হয়। এই পরিবর্তন আসে ধীর পদক্ষেপে দীর্ঘ সময় ধরে।

সমাজের মূলস্রোত ও অন্তেবাসী জনগোষ্ঠীর মধ্যে পার্থক্য ও তাদের মধ্যে উপাদানগত পরিবর্তনের আলোচনায় একথা উল্লেখ করা যেতে পারে যে, সামাজিক, রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে, যে জনগোষ্ঠী মূলস্রোত হিসেবে এক সময় চিহ্নিত হত তা বিশেষ কারণে অনেক সময় তার প্রাধান্য বজায় রাখতে সক্ষম হয় না এবং কালক্রমে অন্তেবাসী গোষ্ঠী হিসাবে পরিগণিত হয়।

অন্তেবাসীগণের অধিকার কিভাবে সুরক্ষিত হতে পারে এ প্রসঙ্গে রাষ্ট্র ও আইনের কি ভূমিকা হওয়া উচিত বর্তমান প্রবন্ধে সে বিষয়ে আলোচনা করা যেতে পারে।

রাষ্ট্র বিজ্ঞানে 'রাষ্ট্র' সম্পর্কিত ধারণা অত্যন্ত জটিল ও বহুমাত্রিক। রাষ্ট্র কি শাসন কার্যে নিযুক্ত কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের সমষ্টি অথবা কতকগুলি আইন সংক্রান্ত নিয়মাবলী দিয়ে গঠিত কোনো সংগঠন, বা সমাজেরই কোনো গৌণ প্রকার ভেদ (Species) অথবা নাগরিক অস্তিত্ব সংক্রান্ত বিশ্বাস ও মূল্যবোধ-এর সংগঠন, রাষ্ট্রের সংজ্ঞা নির্ধারণে এই সব প্রশ্ন আলোচনা করেছেন রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা। রাষ্ট্র ও নাগরিক-এর সম্পর্ক সম্বন্ধে বিভিন্ন রাজনীতিবিদ্‌গণ বিভিন্ন ধারণা পোষণ করেছেন।

বিংশ শতাব্দীতে রাষ্ট্র সম্পর্কিত যে সব মতবাদের উদ্ভব হল, তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মতবাদ হল রাষ্ট্রকে জনকল্যাণমুখী হতে হবে (Welfare State)। এই মতবাদে আস্থাশীল রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা নাগরিকগণের কল্যাণ বিধানের ক্ষেত্রে পরিমাণগত ও গুণগত উভয় উৎকর্ষকেই স্বীকার করেন। রাষ্ট্র আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করবে জনকল্যাণের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য।

আইনের মোটামুটি উদ্দেশ্য দুটি। একদিকে আইন মানুষের কার্যকে বা স্বাধীনতাকে সীমিত করে অপর দিকে আইন ব্যক্তি মানুষের অধিকারকে সুরক্ষিত করে, ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত শাসক বা সরকারের ক্ষমতার রূপরেখা নির্ধারণ করে। অবশ্য নাগরিকগণের অধিকার ও কর্তব্য একটি অপরটির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

স্বাধীনতা যাতে যথেচ্ছাচারিতায় পর্যবসিত না হয় সেটা নিশ্চিত করতে রাষ্ট্র আইন প্রণয়ন করে। কেবল মাত্র নানাবিধ আইন প্রণয়নের দ্বারাই নাগরিকগণের অধিকার সুরক্ষিত হবে এই ধারণা যথার্থ নয়। সমস্যা দেখা যায় আইন বলবৎ করা বা কার্যকর করার ক্ষেত্রে। অনেক সময় নানা কারণবশত আইনের দৃষ্টিতে সকলের সমতারক্ষা বা সমান আইনগত সুরক্ষার ব্যবস্থা হয় না অন্তেবাসী মানুষের ক্ষেত্রে তো একথা বিশেষভাবে প্রযোজ্য। বিষয়টি যথাযথ অনুধাবন করতে গেলে, সমাজ জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে সব আইন প্রণীত হয়েছে নিম্নবর্গ বা দুর্বল শ্রেণীর মানুষদের অধিকার সুরক্ষিত করতে সেগুলি কি কারণে ফলপ্রসূ হয় না তা বিবেচনা করা দরকার।

মানবাধিকার সম্পর্কিত ধারণার ক্রমবিকাশ ও বিবর্তনের আলোচনা প্রসঙ্গে একথা বলা যায় যে সমাজতান্ত্রিক দাবি আদায়ের সংগ্রাম নূতন পটভূমিতে পৌঁছায় প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় বলশেভিক বিপ্লবের পরিপ্রেক্ষিতে। ঐ সময় উদার মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে গঠিত হল লীগ অফ নেশন (১৯১৯) তথাপি শীঘ্রই ফ্যাসিবাদের অভ্যুত্থান উদার মানবাধিকার আদর্শের কণ্ঠরোধ করে। দ্বিতীয়

বিশ্বযুদ্ধের পরিণতি— ফ্যাসিবাদের পরাজয় ঘটায় এবং পৃথিবী দুই মহাশক্তিধর গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এর অনিবার্য ফলশ্রুতি হিসাবে শুরু হয় পৃথিবীব্যাপী ক্ষমতার দ্বন্দ্ব— সার্বিক উদারনীতি (Universal Liberal) ও সমাজবাদী দাবির মধ্যে সংঘাত। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ও জাতির মধ্যে পারস্পরিক মৈত্রী এবং আন্তর্জাতিক সমস্যাগুলির শান্তিপূর্ণ সমাধানের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে।

১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই ডিসেম্বর সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারণ পরিষদ (General Assembly) মানবাধিকার সংক্রান্ত ঘোষণাটি প্রকাশ করে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকল মানুষের জন্য সমান অধিকারের কথা বলা হয়েছে। মানবাধিকার বলতে বোঝান হয়েছে কতকগুলি মৌলিক এবং অচ্ছেদ্য অধিকার যা মানুষের সম্ভ্রম ব্যক্তিমানুষের মূল্য এবং মর্যাদাকে অক্ষুণ্ণ রাখে।

১৯৬৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ ডিসেম্বর সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারণ পরিষদ নাগরিক (Civil) ও রাজনৈতিক (Political) অধিকার-এর অঙ্গীকারপত্র এবং অর্থনৈতিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার-এর অঙ্গীকার পত্র গ্রহণ করে। এই অঙ্গীকার পত্রে ভারত সহ পৃথিবীর বহু দেশই স্বাক্ষর করে।

মানবাধিকারের বিবর্তনের ধারায় আমরা তিনটি পৃথক স্পষ্ট পর্যায় লক্ষ করি।

প্রথম পর্যায়ের (First Generation Right) অধিকারগুলি হল স্বাধীনতা সংক্রান্ত অধিকার বা (Liberty Oriented Right) এই অধিকারগুলি রাষ্ট্র বা সরকারের উপর নঙর্থক দায়িত্ব বা কর্তব্য পালনের নির্দেশ দেয়। ব্যক্তি স্বাধীনতা রক্ষা করার জন্য রাষ্ট্র বা সরকারের কী ধরণের কাজ করা উচিত নয়, সে বিষয়ে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে প্রথম পর্যায়ের মানবাধিকার-গুলিতে।

দ্বিতীয় পর্যায়ের অধিকারগুলি (Second Generation Right) হল নিরাপত্তা সংক্রান্ত অধিকার (Security Oriented Right) যেগুলি ব্যক্তিমানুষের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে। দ্বিতীয় পর্যায়ের অধিকারগুলির তুলনায় প্রথম পর্যায়ের অধিকারগুলি বেশি সদর্থক। কারণ এই অধিকারগুলি যাতে বাস্তবে রূপায়িত করা যায় সেজন্য কী কী করা উচিত রাষ্ট্র বা সরকারের তার নির্দেশগুলির প্রতি আলোকপাত করেছে এই পর্যায়ে অধিকারগুলি।

তৃতীয় পর্যায়ের অধিকারগুলি আরো সাম্প্রতিক আন্তর্জাতিক ঐক্যমতের উপর ভিত্তি করে যে বিষয়গুলি বর্তমানকালে ব্যক্তি মানুষের জীবন প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে। সেগুলির দিকে রাষ্ট্র বা সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয় এই সব অধিকারগুলিতে। এগুলির মধ্যে রয়েছে পরিবেশ সংক্রান্ত সাংস্কৃতিক ও উন্নয়ন বিষয়ক অধিকার। আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার (Right of Self determination) উন্নয়নের অধিকার তৃতীয় পর্যায়ের অধিকারগুলির অন্তর্ভুক্ত।

ফরাসী বিপ্লব ও আমেরিকার স্বাধীনতা ঘোষণার পর সমাজবিজ্ঞানের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি ঘটেছে সমাজবিজ্ঞানে তার বিবর্তনের ধারায় আত্মসন্তুষ্ট আত্মকেন্দ্রিক ব্যক্তিবাদী মানুষকে ছাড়িয়ে সমাজমনস্ক গোষ্ঠী সচেতন মানুষের দিকে ঝুঁকে পড়েছে। সমাজ বিজ্ঞানী ও দার্শনিকরা স্বাধীনতা ও সাম্য সম্পর্কিত ভাবনায় নূতন মাত্রা যোগ করেছেন। একথা তাঁরা জোরের সঙ্গে বলেছেন যে কেবল মাত্র অর্থনৈতিক ও সামাজিক অধিকারসমূহ সেই অবস্থায় নিয়ে যেতে পারে যেখানে শোষণ ও প্রভেদ থাকবে না এবং প্রতিটি ব্যক্তিকে আত্মবিকাশের প্রয়োজনীয় সুযোগ যথেষ্ট পরিমাণে ও সমভাবে বণ্টন করে দেওয়া হবে। এই পটভূমিতে ভারতীয় সংবিধান প্রণেতাগণ আমেরিকান স্বাধীনতা সংগ্রাম ও ফরাসী বিপ্লবের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে কতিপয় স্বাধীনতা এবং অধিকারকে মৌলিক অধিকার বিবেচনা করে সেগুলি রক্ষার ব্যবস্থা করেছেন। এই সব মৌলিক অধিকার ভঙ্গের বিরুদ্ধে ভারতবর্ষের সর্বোচ্চ আদালত বা Supreme Court -এ প্রতিকার প্রার্থনা করা যাবে।

স্বাধীন ভারতের সংবিধান সব নাগরিকের সমান অধিকারকে স্বীকৃতি দিয়েছে। সকলেই নাগরিক হিসাবে আইনের চোখে সমান। কিন্তু সত্যিই কি তাই? দরিদ্র ও অনগ্রসর শ্রেণীর মানুষেরা তাহলে তাদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হয় কেন? সংবিধানের সুনিশ্চিত রক্ষাকবচ সত্ত্বেও বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই অনুন্নত ও অনগ্রসর শ্রেণীর মানুষেরা শোষণ, উৎপীড়ন ও প্রবঞ্চনার শিকার হয় কেন? কেতাবী আইন আর সাধারণ মানুষের বাস্তব অভিজ্ঞতার মধ্যে যে দুস্তর ব্যবধান রয়েছে সেকথা অনেক সময় মাননীয় বিচারপতিরা আক্ষেপের সঙ্গে স্বীকার করেছেন। বিচারপতি ভগবতীর নেতৃত্বে গঠিত একটি কমিটি ১৯৭৭ সালে যে প্রতিবেদন জমা দেয় তার মধ্যে দরিদ্র ও বঞ্চিত মানুষের আইনের শাসনের প্রতি অনাস্থার কথা নির্দ্বিধায় স্বীকার করা হয়েছিল। সেদিনের পর আরো পঁচিশ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে; তবু বাস্তব অবস্থার খুব বেশি পরিবর্তন হয়নি। এখনো সাধারণ মানুষ বিশেষত দরিদ্র অনগ্রসর শ্রেণীর মানুষ পারতপক্ষে আইন আদালত এবং পুলিশ প্রশাসনকে সাধ্যমত এড়িয়ে চলে। এর একটা কারণ, তারা প্রশাসনকে পক্ষপাতহীন মনে করে না; সমাজের প্রভাবশালী ও বিত্তবান মানুষদের প্রতি প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরের অধিকারিকগণের নরম মনোভাবের কথা সমাজের সাধারণ এবং নিম্নবর্গের মানুষের অবিদিত নয়। "ব্যক্তি বিশেষের অবস্থান যত উঁচুতেই হোক না কেন আইনের অবস্থান তার চেয়েও উঁচুতে।" এই সত্যটি প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরের আধিকারিকগণের সর্বদা স্মরণ রাখা একান্ত প্রয়োজন।

জাতীয় পুলিশ কমিশন (তৃতীয়) সমাজের দুর্বলতর মানুষদের প্রতি পুলিশ প্রশাসনের বিশেষ দায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছে। আইন অনুযায়ী সব মানুষের সমান অধিকার কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা যায় ধনী ও প্রভাবশালী মানুষদের অধিকার সমাজের দুর্বলতর ও দরিদ্র মানুষদের অধিকারের চেয়ে অনেক বেশি। তত্ত্বে এবং প্রয়োগে ঐ ব্যবধান দূর করতে না পারলে সামাজিক ন্যায় বিচারের প্রতিষ্ঠা সুদূর পরাহত হবে। সমাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার প্রথম ধাপই হল দুর্বলতর শ্রেণীর অধিকারের যথাযথ মর্যাদা দেওয়া এবং ঐ অধিকারগুলি রক্ষার যথাযথ সুব্যবস্থা করা।

দুর্বল অনগ্রসর শ্রেণীর মানুষ অভিযোগকারীই হন বা অভিযুক্তই হন ন্যায় বিচার তাঁর অবশ্য প্রাপ্য। এই ন্যায় বিচার তাঁর কাছে সহজলভ্য তখনই হবে যখন পুলিশ বিভাগ এবং বিচার বিভাগ তাদের কর্ম ও দায়িত্ব যথাযথ ভাবে পালন করতে পারবেন। দুর্ভাগ্যবশত আমরা লক্ষ করেছি, তদন্তাধীন মামলা এবং বিচারাধীন মামলার সংখ্যা এত বেশি যে সেগুলির আশু নিষ্পত্তি করতে হলে সংশ্লিষ্ট বিভাগ এবং সরকারকে বিশেষ ব্যবস্থা

অবলম্বন করতে হবে।

জাতীয় পুলিশ কমিশন সুপারিশ করেছে নাগরিক অধিকার সুরক্ষার আইন ১৫ ক (২) (গ) ধারা অনুযায়ী বকেয়া বিচারাধীন মামলাগুলি নিষ্পত্তির জন্য রাজ্য সরকারগুলির বিশেষ বিচারালয় খোলা উচিত। বিচারার্থী যত দ্রুত ন্যায় বিচার পাবেন ততই বিচার ব্যবস্থার প্রতি সাধারণ মানুষের আস্থা ও বিশ্বাস সুদৃঢ় হবে।

আইন কমিশন তাঁর বিংশতিতম প্রতিবেদনে বিচার বিভাগের যথেষ্ট সংখ্যক বিচারপতিগণের অভাবের কথা উল্লেখ করেছেন। জনসংখ্যার আনুপাতিক হারে প্রয়োজনীয় সংখ্যক (এক মিলিয়ন লোকসংখ্যার জন্য ৫০ জন) বিচারপতি না থাকার দরুন বিভিন্ন আদালতে বিচারাধীন মামলার সংখ্যা যে ক্রমশ বেড়েই চলেছে তাতে আর আশ্চর্যের কি আছে?

এই প্রসঙ্গে অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করা প্রয়োজন মনে করি। তৃতীয় পুলিশ কমিশন তদন্তকারী অফিসারদের সংখ্যা এবং তাদের আইন শৃঙ্খলা সংক্রান্ত কার্যে ও অন্যান্য বিবিধ দায় দায়িত্বের ব্যস্ততার কথা উল্লেখ করে পুলিশ বিভাগের তদন্তকারী শাখা ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষা দুটি পৃথক শাখা প্রচলনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছেন।

অন্তেবাসী বা সমাজের অনগ্রসর মানুষদের অধিকার রক্ষা করতে হলে অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি সরকার বা রাষ্ট্রকে মনোযোগ দিতে হবে। আমাদের দেশে দুর্বল শ্রেণীর মানুষেরা আর্থিক অক্ষমতাবশত অনেক ক্ষেত্রেই অধিকার রক্ষার প্রশ্নে আইন বা আদালতের আশ্রয় নিতে সমর্থ হন না। প্রয়োজনে দক্ষ আইনজীবীও নিয়োগ করতে পারেন না। সহায় সম্বলহীন মানুষকে বিনামূল্যে আইনের সাহায্য দেওয়া কল্যাণব্রতী রাষ্ট্রের একটি প্রধান কর্তব্য। সংবিধানের ৩৯ (ক) ধারায় বলা হয়েছে দারিদ্র্য বা অন্য কোনো অক্ষমতার দরুন কোনো নাগরিক যদি ন্যায় বিচারের এর অধিকার বা সুযোগ লাভে বঞ্চিত হন তবে তাঁকে সুবিচারের স্বার্থে বিনামূল্যে আইনগত সাহায্য দেওয়া রাষ্ট্রের দায়িত্ব। এই প্রসঙ্গে আইন কমিশনের চতুর্দশ প্রতিবেদন-এ যা বলা হয়েছে তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও প্রণিধানযোগ্য। অন্তেবাসী এবং দুর্বল শ্রেণীর মানুষদের বিনামূল্যে আইনী সাহায্য দেওয়ার উদ্দেশ্যে—জাতীয় আইন পরিষেবা নিগম প্রতিষ্ঠিত হয় ৫ই নভেম্বর ১৯৯৫। মহামান্য বিচারপতি সর্বোচ্চ ন্যায়ালয় ড. এ. এস্. আনন্দ এই নিগমের সভাপতি হিসাবে কার্যভার গ্রহণ করেন ১৭ই জুলাই ১৯৯৭। বিনামূল্যে আইনগত সহায়তা দানের কর্মসূচী অনুযায়ী দরিদ্র ও দুর্বলতর শ্রেণী এবং উপজাতিগণকে সাহায্যদানে এগিয়ে যান। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার সকল সেই সঙ্গে দেশের সমস্ত জেলায় লোক আদালত প্রতিষ্ঠারও প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। লোক আদালত সংক্রান্ত পরীক্ষা আমাদের দেশে বিচার প্রার্থীদের অল্পব্যয়ে দ্রুত বিচার লাভের সম্ভাবনাকে উজ্জ্বল করে তুলেছে। ৩১শে মার্চ ১৯৯৮ অবধি এদেশে ২২৪৫২টি লোক আদালত স্থাপন করা হয় এবং এই সমস্ত লোক আদালতগুলিতে ৬৬২৮২৭০টি মামলার নিষ্পত্তি করা হয়েছে পারস্পরিক বোঝাপড়ার মাধ্যমে। এই সমস্ত মামলাগুলি পূর্বে বিভিন্ন বিচারালয়ে দীর্ঘ দিন থেকে বিচারাধীন ছিল।

জাতীয় আইন পরিষেবা নিগমের কর্মসূচীকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য এবং লোক আদালতকে জনপ্রিয় করার জন্য প্রয়োজন জনগণ বিশেষত অন্তেবাসী ও দুর্বলতার শ্রেণীর মানুষদের মধ্যে সচেতনতা জাগিয়ে তোলা তাদের অধিকার ও দায়িত্ব সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞান লাভের সুযোগ সুবিধা দিতে হবে। The Legal Services Authorities Act 1987 (Act 29 of 1987) উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য পূর্ণ হবে না যদি না এই আইন যাদের সুবিধার জন্য প্রণয়ন করা হয়েছে তারা তাদের অধিকার, সুযোগ সুবিধা যেগুলি এই আইন মোতাবেক তাদের প্রাপ্য, সেগুলি সম্পর্কে যথাযথভাবে অবহিত না থাকে।

এই কারণে প্রয়োজন অন্তেবাসী এবং সমাজের দুর্বল বা অনগ্রসর শ্রেণীর মধ্যে শিক্ষার বিস্তার ঘটিয়ে তাদের চেতনার মান উন্নত করা।

সমাজের দুর্বলতর শ্রেণীর মানুষদের অধিকার রক্ষায় পুলিশের ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে জাতীয় পুলিশ কমিশন উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ করেছিলেন যে তপশিলী জাতি বা দুর্বলতর শ্রেণীর মানুষেরা শারীরিক আক্রমণের শিকার হলে সেই সংক্রান্ত ঘটনাগুলি যথাযথ ভাবে নথিভুক্ত হয় না। পুলিশ কমিশনের মতে এই সব ঘটনাগুলি যাতে যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে লিপিবদ্ধ হয় সেদিকে সরকারের সতর্ক দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। ১৯৯৪ খ্রীষ্টাব্দে রাজ্যসভায় এক বিবৃতিতে সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছিল যে ১৯৯১-১৯৯৩ সালের মধ্যে তপশিলী জাতি ও উপজাতি লোকেদের নির্যাতনের নিবন্ধীকৃত ঘটনার সংখ্যা প্রায় ৬২০০০। অবশ্য নথিভুক্ত ঘটনার পরিসংখ্যান সর্বদা বাস্তব পরিস্থিতির যথার্থ পরিচায়ক হয় না। এ জন্য অপরাধ সম্পর্কিত পরিসংখ্যান যাতে বাস্তবানুগ হয় সে বিষয়ে লক্ষ রাখা সকলের কর্তব্য।

কৃষিক্ষেত্রে ও শিল্পক্ষেত্রে শ্রমজীবী মানুষদের মধ্যে অন্তেবাসী মানুষদের সংখ্যা নিতান্ত নগণ্য নয়। শিল্পক্ষেত্রে শ্রমজীবীগণ তুলনামূলক ভাবে বেশি সংগঠিত। বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠন শিল্প শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষার দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখার ফলে যখনই তাদের অধিকার ভঙ্গের ঘটনা ঘটে তখন শ্রমিক সংগঠনগুলি তাদের আন্দোলন মূলক কর্মসূচী গ্রহণ করে তার প্রতিবিধানের চেষ্টা করে। তবে শ্রমিকদের যে অংশ সংগঠিত নয় শ্রমিকদের মধ্যে অন্তেবাসীদের অনেক অধিকার ভঙ্গের বিষয়গুলির প্রতিকার হয় না।

একই কাজের জন্য একই মজুরীর অধিকার শ্রমজীবীদের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অধিকার ভারতীয় সংবিধানের ৩৯ নং ধারায় (Article) সরকারের প্রতি নির্দেশ অনুচ্ছেদ রয়েছে নারী পুরুষ নির্বিশেষে সকলের ক্ষেত্রেই সমান কাজের জন্য সমান মজুরী ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে। সংবিধানের ৪৩ ধারায় রাষ্ট্রকে এ বিষয়ে যথাযথ আইন প্রণয়ন-এর দ্বারা সকল স্তরের শ্রমিকদের কৃষিক্ষেত্রে ও শিল্পক্ষেত্রে নির্বেশেষে জীবনধারণের উপযোগী মজুরী ও সুস্থ ও সুন্দর জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় অবস্থা, অবসর সাংস্কৃতিক সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করতে হবে। এমন কি ভারতীয় সংবিধান প্রবর্তনের পূর্বেও সমকালীন সংসদ একটি আইন প্রণয়ন করেন The Payment of Wages Act 1936 । এছাড়া শিল্পক্ষেত্রে নিয়মানুবর্তিতা বজায় রাখার জন্য সংসদ আরো যে সমস্ত আইন প্রবর্তন করেন সেগুলি হল: Industrial Dispute Act 1938, Industrial Employment Act 1946 (Standing Order), Industrial Dispute Act 1947 শ্রমিক ও শিল্পক্ষেত্রে অন্যান্য কর্মচারীদের সঙ্গত নূন্যতম মজুরী নির্ধারণ নিশ্চিত করার জন্য প্রবর্তিত হল The Minimum Wages Act 1948 । কৃষিক্ষেত্রে অনগ্রসর

শ্রমিকদের স্বার্থ ও মানবাধিকার রক্ষার ক্ষেত্রে গ্রাম পঞ্চায়েতগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে।

অন্তেবাসীগণের মানবাধিকার রক্ষার বিষয়টি একক ভাবে রাষ্ট্র বা সরকারের দায়িত্ব নয়। কেবলমাত্র আইন প্রণয়ন করে এবং কয়েকটি প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করে এই সমস্যার সুচারু সমাধান সম্ভব নয়।

অন্তেবাসীগণের মানবাধিকার রক্ষার বিষটির বৃহত্তর আর্থ-সামাজিক পটভূমি আছে। সেই পটভূমি থেকে অন্তেবাসীগণের অধিকাংশ সমস্যার উৎপত্তি হয়। এসব সমস্যার সমাধানে তাই সমাজবিজ্ঞানী ঐতিহাসিক, অর্থনীতিবিদ্, শিক্ষাবিদ্, আইনবিদ্, বেসরকারী সংগঠন এমন কি সাধারণ নাগরিকগণের যৌথ প্রচেষ্টার এক বিরাট ভূমিকা আছে।

এক দিকে যেমন রাষ্ট্র ও প্রশাসনকে আরও বেশি জনমুখী করা দরকার তেমনি সমাজের রূপান্তরশীল চেতনার সঙ্গে মিল রেখে সাধারণ নাগরিকগণের সচেতনতা ও সতর্কতা আরো বাড়ান প্রয়োজন। (সেটা সম্ভব হতে পারে তখনই, যখন সমাজের প্রতিটি স্তরে শিক্ষার আলোক প্রবেশ করতে পারবে স্বচ্ছন্দ গতিতে।) যখনই কোনো অধিকার ভঙ্গের পরিস্থিতির উদ্ভব হবে তখনই কর্তব্য ও অধিকার সচেতন নাগরিক সক্ষম হবে অধিকার রক্ষার জন্য আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণে। কারণ আমরা জানি চিরন্তন সতর্কতাই স্বাধীনতার মূল্য।

ঘাটমুড়ার উৎসারিত আলো

মাঝে মাঝেই মঠ মিশন পরিচালিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রাক্তনীরা একটি প্রশ্নের মুখোমুখী হই— রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন কর্তৃক পরিচালিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছাত্রেরা শিক্ষাকালীন প্রশস্ত উচ্চাদর্শ, বিশেষত উচ্চ সেবাদর্শ, সামাজিক জীবনে পরবর্তীকালে রূপায়ণের চেষ্টা কতটা করছে। এমন দাবি করা যাবে না যে এইসব প্রতিষ্ঠানের প্রাক্তনীরা সকলেই খুব সক্রিয় ভাবে এই চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। তবে, সন্দেহ নেই, কেউ কেউ অনেকক্ষেত্রে নীরবে এই চেষ্টা করে চলেছেন দেশের নানা প্রান্তে। অনেকেই প্রচারবিমুখ এবং অন্তর্মুখী হওয়াতে আমরা এদের কাজকর্মের খবর পাই না। বিদ্যামন্দিরের কয়েকজন প্রাক্তন ছাত্রের সক্রিয় উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত এমন একটি প্রতিষ্ঠানের কথা আমরা এবার আলোচনা করব।

গ্রামের নাম ঘাটমুড়া, জেলা মেদিনীপুর (পশ্চিম)। গড়বেতা অঞ্চলের এই গ্রামটি পশ্চিমবঙ্গের আর পাঁচটি পিছিয়ে পড়া গ্রামের সকল বৈশিষ্ট্য নিয়েই ধুঁকছিল। এই গ্রামেরই একটি ছেলে পড়তে এল বিদ্যামন্দিরে। ঠাকুর স্বামীজীর আদর্শের সঙ্গে পরিচত হল সে। ১৯৮২র যুবসম্মেলনে যোগ দিল মহাউৎসাহে। তারপরই তার মাথায় ঢুকে গেল নিজের গ্রামের জন্যে একটা কিছু করার চিন্তা।

আর এই চিন্তার শরিক হলেন বিদ্যামন্দিরের আর দুজন প্রাক্তনী— তখন বিদ্যামন্দির-প্রশাসনের সঙ্গে যুক্ত স্বামী দিব্যানন্দ এবং স্বামী সর্বগানন্দ। ঘাটমুড়ার দুলাল সেন বিদ্যামন্দিরের আঙিনায় কুড়িয়ে পেল সেই আগুন যার শিখায় দূরীভূত হতে পারে বহু যুগের সঞ্চিত অন্ধকার। জন্ম নিল ঘাটমুড়া বিবেকানন্দ পাঠচক্র। বিগত দুটি দশক ধরে এই সংস্থা ঘাটমুড়া গ্রামের সার্বিক উন্নয়নের সঙ্গে সমার্থক হয়ে আছে।

'শিবজ্ঞানে জীবসেবা'র আদর্শ রূপায়ণের ব্রত নিয়ে শুরু হল অভিযাত্রা। প্রাথমিক গুরুত্ব দেওয়া হল শিক্ষার প্রসারের উপর। গ্রামের কিছু দরিদ্র ছেলে মেয়ে নিয়ে অবৈতনিক কোচিং শুরু হল। কেবল বিদ্যালয়ের পাঠক্রম নয়— এইসব ছাত্রছাত্রীদের চারিত্রিক বিকাশের দিকে বিশেষ নজর দেওয়া হল। আঠারো অনূর্ধ ছেলেমেয়েদের জন্য ব্যবস্থা হল বিধিমুক্ত শিক্ষা কার্যক্রম। গ্লোব, মডেল, চার্ট ইত্যাদির সাহায্যে বিভিন্ন বিষয়ে দেওয়া হল প্রাথমিক জ্ঞান। গ্রামের ছেলেমেয়েদের সাধারণজ্ঞান, স্বাস্থ্যসচেতনতা ইত্যাদির সঙ্গে সঙ্গে তাদের সুকুমার বৃত্তিগুলির বিকাশের দিকে নজর দেওয়া হল। এরজন্যে মাঝে মাঝে শিক্ষা শিবিরের আয়োজন করা হল। বিদ্যামন্দিরের প্রাক্তন ও বর্তমান বিদ্যার্থীদের অনেকেই যোগ দিলেন এই শিবিরে। নিম্নবিত্ত ও দরিদ্র পরিবারের ছাত্রদের বই কেনার পয়সা নেই। বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণেরও ব্যবস্থা করল পাঠচক্র। এই কর্মপ্রচেষ্টা ও কার্যক্রম অব্যাহত দুটি দশক ধরে।

স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা শিবিরের নিয়মিত আয়োজন পাঠচক্রের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। পাঠচক্রের উদ্যোগে প্রতি মাসে কলকাতার বিশিষ্ট চিকিৎসকরা আসেন উন্নত চিকিৎসাপদ্ধতির সহায়তায় গ্রামের মানুষদের সেবা করতে। এ ছাড়া বছরে একাধিকবার আয়োজিত হয় বিশেষ স্বাস্থ্য শিবির— আসেন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা। উল্লেখ্য, এঁদের মধ্যে অনেকেই মঠ-মিশন পরিচালিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রাক্তনী। নামমাত্র অর্থমূল্যে স্বাস্থ্য শিবিরের রোগীদের ওষুধ দেওয়া হয়। হলদিয়া 'নেত্র নিরাময় নিকেতনের' উদ্যোগে প্রতিবছর ১০০০ জনের চক্ষুচিকিৎসা হয়। ছানি ও অন্যান্য অস্ত্রোপচার করা হয় প্রতিবছর প্রায় ২৫০ জন রোগীর। ইন্ডিয়ান ডেন্টাল এ্যাসোসিয়েশনের বিশিষ্ট দন্তচিকিৎসকগণ আধুনিক সরঞ্জাম নিয়ে আসেন গ্রামের রোগীদের চিকিৎসা করতে। শিশুস্বাস্থ্য, শিশুর সুরক্ষায় মায়ের ভূমিকা ইত্যাদি নিয়ে সচেতনতা শিবিরের আয়োজন করা হয়। ২০০২ থেকে অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসার পাশে পাশে টি.এস.ও.এন. ফান্ডের পৃষ্ঠপোষকতায় একটি সাপ্তাহিক হোমিওপ্যাথি চিকিৎসাকেন্দ্রও খোলা হয়েছে।

২০০২ থেকে চালু হয়েছে পাঠচক্রের নিজস্ব পানীয় জল প্রকল্প। সকলের জন্য বিশুদ্ধ জল শ্লোগানটিকে বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন অনেকেই। এখন পাঠচক্রের নিজস্ব জমিতে একটি স্থায়ী পাকা কার্যালয় তৈরি হয়েছে। সেখানে চালু হয়েছে একটি স্থায়ী চিকিৎসাকেন্দ্র। গ্রামবাসীদের স্বনির্ভর করার লক্ষ্যে বিভিন্ন এন.জি.ওর সহায়তায় চালু হয়েছে নানান প্রকল্প।

বিগত কুড়ি বছরে পশ্চিম মেদিনীপুরের একটি প্রত্যন্ত গ্রামের এই প্রতিষ্ঠানটির সাফল্যের খতিয়ান উজ্জ্বলতর ভবিষ্যৎকেই সূচিত করে। সংগঠকদের সদিচ্ছা, গ্রামবাসীদের শুভেচ্ছা এবং শ্রীশ্রী ঠাকুর, মা ও স্বামীজীর আশীর্বাদে ঘাটমুড়া বিবেকানন্দ পাঠচক্র আরো অনেক সফলতার অধ্যায় রচনা করুক, এই আমাদের কামনা।

কবিতা

স্বীকারোক্তি

ঠিক যতক্ষণ ডুবে থাকি
নিঃস্বপ্ন ঘুমের গভীরে—
ততক্ষণই পবিত্র থাকি আমি।

অন্যত্র ভিড় করে দিনযাপনের গ্লানি;
খোঁয়াড়ের পাশে দিনে-দিনে জমে ওঠা
স্তূপাকার বর্জ্য-আবর্জনা;
নারকীয় পুঁজ-রক্ত, পার্থিব কামিনী কাঞ্চন।
গৃহস্থের জতুগৃহে সাংসারিক বহ্যুৎসব
তার মাঝে বসে ভাবি— ভালোই আছি!
এভাবেই দিনভর আত্মপ্রবঞ্চনার ভান...
বেড়ে ওঠে জীবনের দুর্বহ ভার।

জেগে থাকলেই প্রতারণা করতে হয় নিজেকে;
মন-গড়া কথার সুগন্ধি তেলে
কোনোমতেই মেলে না কাজের জল;
চলে কেবল মন-রাখা কথার বুনন...

নিয়মমাফিক যার জন্য বার্থ ডে, নিউ-ইয়ার গ্রীটিং
এদিকে কিন্তু মনে মনে বেশ জানি:
আমার এক-পা এগোনোর জন্যে
জরুরি তার দু'কদম পশ্চাদপসরণ।
অভিসন্ধিকে আড়াল করা তাই অভিনয়ের দুর্ভেদ্য দেওয়ালে!

তাই সেই সুযুপ্তির ভিতর
বসি আমি অ-লৌকিক কনফেশনে
আমার অচেতন স্বপ্নহীন ঘুমের অবসরে
শোনো তুমি সেই অকপট স্বীকারোক্তি।
ভেবো না অবোধ শিশুর দেয়ালা,
মনে করো না প্রলাপ তাকে
তখনই বিচার করো আমার এ স্বেচ্ছা-দ্বিচারিতার।
সে-ই আমার হাসরের ময়দান,
চার্চের কনফেশনাল!

কান দিও না আমার জাগ্রত প্রার্থনায়
ফিরেও দেখো না আমার
লোকদেখানো ভক্তি, প্রকাশ্যে সেবা
জপমালা আর দান-খয়রাতে।

আমার নিঃস্বপ্ন ঘুমের মধ্যেই বরং তুমি এসো
ঠিক ততক্ষণই যে
কায়মনোবাক্যে পবিত্র থাকি!

ট্যান্টালাম আবিষ্কারের ২০০ বছর

সলিল মুখোপাধ্যায়

যদিও সাধারণভাবে মনে হয় ট্যান্টালাম (Tantalum) ধাতুটি বোধহয় একেবারে নতুন কিন্তু এই ধাতুটির উপস্থিতি প্রথম ধরা পড়ে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমের দিকে। এই মৌলটি ১৮০২ সালে আবিষ্কৃত হয়েছিল অর্থাৎ আজ থেকে ২০০ বছর আগে। বিজ্ঞানী একবার্গ ছিলেন এর আবিষ্কারক।

১৮০২ সালে ডিসেম্বর মাসে একবার্গ (A. Ekeberg) নামে এক সুইডিশ বিজ্ঞানী সুইডেনের একটি গ্রাম থেকে কতকগুলি খনিজ পদার্থের নমুনা সংগ্রহ করেন। ঐ খনিজগুলিকে বিশ্লেষণ করে তিনি একটি নতুন মৌলের সন্ধান পান। এমনকি ঐ খনিজগুলি থেকে নতুন মৌলের সাদা রঙের অক্সাইডকে বের করতে সমর্থ হন। ঐ অক্সাইড থেকে নতুন মৌলটি পৃথক করার জন্য বিজ্ঞানী একবার্গ এটিকে তীব্র অ্যাসিডে দ্রবীভূত করার চেষ্টা করেন কিন্তু অক্সাইডটি তীব্র অ্যাসিডেও দ্রবীভূত হয় না। তিনি বারবার ঐ সাদা রঙের অক্সাইডটিকে তীব্র অ্যাসিডে দ্রবীভূত করার চেষ্টা করতে থাকেন কিন্তু প্রতিবারই ব্যর্থ হন। তবুও নতুন মৌলের আবিষ্কার সম্বন্ধে বিজ্ঞানী একবার্গ খুবই নিঃসন্দেহ ছিলেন। তিনি এই নতুন মৌলটির নাম রাখেন ট্যান্টালাম। এটি এসেছে 'ট্যান্টালাসের যন্ত্রণা' থেকে। অর্থাৎ ব্যর্থ প্রয়াস। যেহেতু এই ধাতুটিকে এর আকরিক থেকে পৃথক করতে খুবই অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল তাই এই ধাতুটির নাম গ্রীক পুরাণের জিয়ুস (Zeus) -এর ছেলে ট্যান্টালাসের নাম অনুসারে রাখা হয়েছিল ট্যান্টালাম। ট্যান্টালাস তাঁর কৃত অপরাধের জন্য জলের ওপর দাঁড়িয়েও যতবার জলপান করার চেষ্টা করেছিলেন ততবারই ব্যর্থ হন। প্রতিবারই জলের উপরিতল নিচে নেমে গিয়েছিল। পৌরাণিক কাহিনীতে ট্যান্টালাসের এই চিরতৃষিত থাকার কাহিনীর থেকে এই মৌলের নামকরণ করা হয়েছিল 'ট্যান্টালাম'। আর খনিজটির নাম রাখা হয় ট্যান্টালাইট।

বিজ্ঞানী বার্জেলিয়াসের ছাত্র এইচ. রোজ (H. Rose) লক্ষ করেন যে ট্যান্টালামের সঙ্গে সব সময় অন্য একটি মৌল মিশে থাকে যার ধর্ম ট্যান্টালামের প্রায় অনুরূপ। তাই ট্যান্টালামকে পৃথক করা এত কষ্টকর। ১৮৪৫ সালে বিজ্ঞানী রোজ ট্যান্টালাইট ও কুলম্বাইট আকরিকের মধ্যে ট্যান্টালাম অক্সাইডের সঙ্গে নায়োবিয়াম অক্সাইডের উপস্থিতিও লক্ষ করেন। কিন্তু নায়োবিয়াম এবং ট্যান্টালামের পৃথকীকরণের কাজটি বেশ মুশকিল হয়ে পড়ে। অনেকদিন পর্যন্ত ট্যান্টালাম ও নায়োবিয়ামকে বিজ্ঞানীদের মধ্যে কেউ কেউ একই মৌল মলে মনে করতেন। বিজ্ঞানী রোজ নানান পরীক্ষার মাধ্যমে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছান যে ট্যান্টালাম ও নায়োবিয়াম দুটি আলাদা ধাতু এবং আলাদা মৌল।

১৮৬৫ সালে সুইস রসায়নবিদ জে.সি. গেলিসার্ড ডি মেরিগ্ন্যাক (J.C. Galissard De Marignac) লক্ষ করেন যে পটাশিয়াম ফ্লুয়োট্যান্টালেট এবং পটাশিয়াম ফ্লুয়োনায়োবেটের হাইড্রোফ্লুরিক অ্যাসিডে দ্রাব্যতার পার্থক্য আছে। এই বিশেষ ধর্মটি বিজ্ঞানীদের এই দুটি মৌল আলাদা করতে নানাভাবে সাহায্য করেছিল। অনেক বিজ্ঞানী এই দুটি মৌলকে বিশুদ্ধ অবস্থায় প্রস্তুত করতেও চেষ্টা করেন।

যদিও ট্যান্টালাম ধাতুটি ১৮০২ সালে আবিষ্কৃত হয়েছিল কিন্তু এই ধাতুটিকে বিশুদ্ধ অবস্থায় নিষ্কাশিত করতে প্রায় একশ বছরেরও বেশি সময় লেগেছিল। অবশেষে ১৯০৫ সালে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের বিজ্ঞানী ডাবলু. ভন বোল্টেন (W.Von Bolten) ট্যান্টালাম ধাতুকে বিশুদ্ধ অবস্থায় নিষ্কাশন করতে সক্ষম হন। তিনি শতকরা ৯৯ ভাগেরও বেশি বিশুদ্ধতায় ট্যান্টালাম ধাতুকে নিষ্কাশিত করেন।

ট্যান্টালাম সাধারণত মুক্ত অবস্থায় পাওয়া যায় না। অন্য আকরিকের সঙ্গে মিশে থাকে। ট্যান্টালাম ধাতুর প্রধান আকরিক হল ট্যান্টালাইট ও কুলম্বাইট। এই আকরিকগুলি প্রধানত আয়রন, ম্যাঙ্গানিজ, নায়োবিয়াম এবং ট্যান্টালাম ধাতুর অক্সাইডের মিশ্রণ। তাছাড়া অল্প পরিমাণে টিন এবং জারকোনিয়াম ধাতুর উপস্থিতিও লক্ষ করা যায়। যদিও ট্যান্টালামের আকরিক ভাণ্ডার অনেক কম কিন্তু ভূপৃষ্ঠে ট্যান্টালাম ও নায়োবিয়াম একত্রে শতকরা ০.০০৩ ভাগ থাকে। ট্যান্টালাম ধাতুর আকরিক প্রধানত মধ্য ও দক্ষিণ আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া এবং পর্তুগালে পাওয়া যায়। আমাদের দেশে এই ধাতুটির সঠিক অবস্থান নিয়ে তেমন পরিসংখ্যান চোখে পড়েনি।

আকরিক থেকে ধাতব ট্যান্টালামের বিশুদ্ধিকরণ (Purification) -এর পদ্ধতি বেশ জটিল। আকরিককে প্রথমে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড দিয়ে বিগলিত (Fusion) করা হয়। তারপর জল ও অ্যাসিড দিয়ে অনুস্রাবণ (Leaching) পদ্ধতিতে ট্যান্টালাম ধাতুর অক্সাইডকে ধুয়ে ফেলা হয়। এরপর হাইড্রোফ্লুরিক অ্যাসিড ও পরে মিথাইল আইসো বিউটাইল কিটোন (MIBK) যোগ করে ট্যান্টালাম ফ্লুরাইডকে পৃথক করা হয়ে থাকে। ঐ দ্রবণে পটাশিয়াম ফ্লুরাইড যোগ করলে অদ্রাব্য পটাশিয়াম ফ্লুট্যান্টালেট পাওয়া যায়।

এই যৌগটিকে শুকিয়ে নিয়ে গলানো হয় এবং সোডিয়াম ধাতুর সঙ্গে তরল অবস্থায় বিক্রিয়া করা হলে ধাতব ট্যান্টালামের গুঁড়ো পাওয়া যায়। এই ট্যন্টালামের গুঁড়ো জল দিয়ে ভালো করে ধুয়ে নিয়ে বায়ুশূন্য (Vacuum) পাত্রে আবার গলিয়ে ট্যন্টালাম ধাতুর দণ্ড তৈরি করা হয়। এই ধরনের অনেকগুলি ছোটো ছোটো দণ্ডকে বিশেষ ধরনের চুল্লীতে গলিয়ে নিলে ট্যান্টালাম ধাতুর মোটা দণ্ড (Ingot) পাওয়া যায়।

ট্যান্টালাম একটি ধূসর সাদা রঙের ধাতু এবং এটি খুব নমনীয়। এর গলনাঙ্ক ২৮৫০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড এবং স্ফুটনাঙ্ক ৫৪২৫ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। রেনিয়াম ও ট্যাংস্টেন ধাতু ছাড়া অন্য যে কোন ধাতুর থেকে এর গলনাঙ্ক বেশি। এই ধাতুটি শক্ত কিন্তু ভঙ্গুর নয়। তাই ধাতুটিকে নানান কাজে লাগানো যায়। ট্যান্টালাম একটি উচ্চ প্রসার্যতা (ductility) সম্পন্ন ধাতু অর্থাৎ এই ধাতুটিকে টেনে অতি সূক্ষ্ম তার তৈরি করা যায়, যার ব্যাস প্রায় ০.০২৫ মিলিমিটার পর্যন্ত হতে পারে । এই ধাতুটি ঘাতসহ (malleable) অর্থাৎ পিটিয়ে পাতে পরিণত করা যায়। প্রায় ০.০১২ মিলিমিটার পুরু পাত (foil) ট্যান্টালাম ধাতু দিয়ে তৈরি করা যেতে পারে। আজকাল এইসব পাতলা পাত আধুনিক ইলেকট্রনিক বর্তনীতে বেশি ব্যবহৃত হচ্ছে। ট্যান্টালাম বেশ কয়েকটি ধাতুর সঙ্গে সংকর ধাতু (Alloy) তৈরি করতে পারে। এদের মধ্যে ট্যাংস্টেন, নায়োবিয়াম, হাফনিয়াম, টাইটানিয়াম, ঘর্ষণজনিত যন্ত্রপাতি (abrasiue tools) তৈরিতে ব্যবহৃত হয় ট্যান্টালিয়াম কার্বাইডে ২০ আণবিক শতাংশ হাফনিয়াম কার্বাইড দিয়ে যে সংকর ধাতু তৈরি হয় সেই সংকর ধাতুর গলনাঙ্ক ৪০০০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। এত উচ্চ-গলনাঙ্কযুক্ত আর কোনো ধাতু বা সঙ্কর ধাতু প্রধানত স্টিম টারবাইনের ব্লেড ও ভালবে, বিভিন্ন পাতন যন্ত্রে (Distillation Equipment) বিভিন্ন রাসায়নিক রাখার পাত্রে (Container) এবং রাসায়নিক শিল্পের বিভিন্ন পাইপ লাইনে ব্যবহার করা হয়। তাছাড়া আকাশে ওড়ার জন্য রকেটের বিভিন্ন যন্ত্রাংশে এই ধাতুটির সংকরের ব্যবহার লক্ষ করা যায়। কাঁচের মতো ট্যান্টালাম ধাতুর রাসায়নিক ক্ষয় প্রতিরোধ ক্ষমতা আছে। এই ধাতুটি অম্ল ও ক্ষারের সঙ্গে সহজে বিক্রিয়া করে না, তবে গলিত ক্ষারের (fused alkali) সঙ্গে বিক্রিয়া করতে পারে। এই রাসায়নিক শিল্পে বেশি ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। যদিও তীব্র অম্লের সঙ্গে এই ধাতুটি তেমনভাবে বিক্রিয়া করে না কিন্তু ফ্লুরিন গ্যাসের সঙ্গে সাধারণ তাপমাত্রায় বিক্রিয়া করে। তাছাড়া সালফার, ক্লোরিন বা ব্রোমিন গ্যাসের সঙ্গে উচ্চ তাপমাত্রায় বিক্রিয়া করে।

তড়িৎ রাসায়নিক পদ্ধতিতে ট্যান্টালাম ধাতুর প্রলেপ দেওয়া যেতে পারে। এইভাবে যে প্রলেপ (Film) তৈরি হয় সেটি খুবই মজবুত (Stable) অর্থাৎ এই প্রলেপের ভিতর তড়িৎ বিশ্লেষ্য সহজে ঢুকতে পারে না। ছোটো সাইজের তড়িৎধারক (Capacitor) তৈরি করার জন্য ট্যান্টালাম ধাতুর ব্যবহার লক্ষ করা যায়। ধারকত্ব (Capacitance) দিয়ে বিচার করলে বলা যায় যায় সমআয়তন অ্যালুমিনিয়াম পাতের যে ধারকত্ব সেই ধারকত্ব বজায় রাখতে যদি ট্যান্টালামের পাত ব্যবহার করা হয় তবে তার আয়তন দশ ভাগের একভাগ পর্যন্ত হতে পারে। পরীক্ষাগারে বিভিন্ন রাসায়নিক যন্ত্রাংশে, বৈদ্যুতিক বাতির ফিলামেন্টে এই ধাতুটির ব্যবহার রয়েছে। আগে ঝরনা কলম (Fountain Pen) -এর নিব অর্থাৎ কলমের ডগায় এই ধাতুটি ব্যবহার করা হত। বিশেষ ধরনের চশমার কাঁচে ট্যান্টালাম অক্সাইডের ব্যবহার রয়েছে।

বিশুদ্ধ ট্যান্টালাম ধাতুর আর একটি বৈশিষ্ট্য হল এই ধাতুটি প্রাণীদেহ কোষের বিভিন্ন তরল ও কোষ কলার সঙ্গে বিক্রিয়া করে না। এমনকি দেহকোষের অন্য জীবাণু (Organism)-র সঙ্গেও বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয় না। অর্থাৎ এটি প্রায় নিষ্ক্রিয় থাকে। মজার ব্যপার হল প্রাণীদেহে এই ধাতুটির কোনো পাতলা পাত (Plate) বা তার (wire) প্রবেশ করালে তার ওপর প্রাণীকলা জন্মাতে পারে। তাই মানবদেহে হাড়ের অস্ত্রচিকিৎসায় কিংবা অন্য দেহাংশে অপারেশনের সময় প্রয়োজনে ট্যান্টালাম ধাতুর তৈরি তার বা পাতের সাহায্য নেওয়া হয়ে থাকে। ট্যান্টালাম ধাতুর তৈরি খুব সূক্ষ্ম-সূক্ষ্ম তারের ঘন জাল (gauze) মানবদেহে কোনো কোনো হার্ণিয়া অপারেশনের সময় নিম্নাংশের দেহপ্রাচীরকে শক্ত করে ধরে (reinforcement) রাখতে ব্যবহার করা হয়।

ট্যান্টালাম ধাতুর জলে দ্রাব্যতা নেই। তাই বিষক্রিয়ার সম্ভাবনা নেই। তবে ট্যান্টালামের ধাতব গুঁড়ো ব্যবহার করার সময় সাবধানতা অবলম্বন করা দরকার কারণ খুব বেশি উত্তপ্ত অবস্থায় এতে আগুন ধরার সম্ভাবনা থেকে যায়।

যদিও ট্যান্টালাম আবিষ্কৃত হয়েছিল আজ থেকে ২০০ বছর আগে কিন্তু এর ব্যবহার আজও সীমিত। এমনকি খুব কম দেশে এই ধাতু নিষ্কাশন করা হয়। মানুষের প্রয়োজনে এই রহস্যময় ধাতুটির ওপর আরো বেশি গবেষণার প্রয়োজন।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

1. Rare Metals by J.DeMent and H.C.Dake, Chemical Publishing Co, Newyork, 1946.
2. Kent's Mechanical Engineer's Hand Book, Edited by Colin Carmichael, 12th edition John wiley & Sons, Inc, Newyork.

পুরানো সেই দিনের কথা

অর্ধেন্দুশেখর দাশগুপ্ত

'বিদ্যামন্দিরে' কলেজ-জীবনের প্রথম দু'বছর অতিবাহিত করব এমন কোনো নিশ্চয়তা মোটেই ছিল না। ব্যাপারটা নিতান্তই আকস্মিক— সম্ভবত পূর্ব নির্ধারিত বলেই।

আমাদের গ্রামে (সেনবাড়ি জেলা ময়মনসিংহ) যে হাই-স্কুলটি ছিল সেখান থেকেই ম্যাট্রিকুলেশান পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হই ১৯৪৫ সালে। তখনো দেশ ভাগাভাগি হয়নি। আমাদের ময়মনসিংহ শহরে তখন ছিল 'আনন্দমোহন'' কলেজ। মোটামুটি ঠিক ছিল সেখানেই পড়ব। বাড়ি থেকে মাত্র বারো মাইল দূর। ট্রেনে যাত্রারও বন্দোবস্ত আছে। নিতান্তই নিত্যযাত্রী পছন্দ না হলে, কলেজের সুবিশাল ছাত্রাবাসের ব্যবস্থাও উত্তম।

ম্যাট্রিক পরীক্ষার পর কিছুদিন অবসর কাটানোর জন্যে কলকাতা আসি। আমার মেশোমশাই তখন সরকারি চাকরি করেন। দমদমে তাঁর একই বাড়িতে অফিস ও আবাস স্থল। ওঁরা বহুদিন ধরেই রামকৃষ্ণ মিশনের ভক্ত হিসাবে পরিচিত। কথায় কথায় আমার পড়াশোনার প্রসঙ্গ উঠলে মেশোমশাই বললেন রামকৃষ্ণ-মিশনের তত্ত্বাবধানে বেলুড়ে একটি নতুন কলেজ স্থাপিত হয়েছে এবং সেটি আবাসিক। শুনে, আমার মায়ের খুবই ইচ্ছে হল আমাকে বিদ্যামন্দিরের ছাত্র করতে। সেইমতো একদিন বিকেলে আমরা সবাই মিলে বিদ্যামন্দিরে এলাম। জীবনে প্রথমবার সেখানেই প্রিন্সিপাল মহারাজ স্বামী তেজসানন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎকার। তাঁকে প্রণাম করার পরে-তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'কি-রে, বাড়ি থেকে এতদূরে থাকতে পারবি তো!' তিনি নিজে আমাদের সঙ্গে নিয়ে ছাত্রাবাসের বাড়িটি ঘুরে দেখালেন এবং প্রথমত দেখালেন আমাদের প্রার্থনা-কক্ষটি। প্রথম-দর্শনেই আমার খুব ভালো লাগল। বাহুল্যবর্জিত কক্ষটিতে একটু উঁচুতে শ্রীশ্রীঠাকুর, মা ও স্বামীজি মহারাজের ছবি। ঘরে কিছু বাদ্যযন্ত্র— খোল, করতাল এবং একটি অর্গান। প্রার্থনা সভা, স্বয়ং মহারাজ রোজ সকাল সন্ধ্যায় পরিচালনা করতেন। উনি বললেন, 'দেখো বাপু, আমাদের এখানে থাকতে হলে প্রার্থনা সভায় যোগ দেওয়া কিন্তু আবশ্যিক।' প্রসন্ন মন নিয়ে বাসায় ফিরলাম। মহারাজ বাবাকে বললেন, 'আপনার ছেলেকে ভর্তি করে নিচ্ছি।' নিয়মানুযায়ী খরচ-পত্রের কথাও জানালেন।

তারপর একদিন, নির্ধারিত সময়ে বিছানাপত্র, ট্রাংক ইত্যাদি নিয়ে ছাত্রাবাসে প্রবেশ করলাম। যে কক্ষটি আমাকে দেওয়া হল, সেখানে আরো দু'জন ছাত্র আছেন। মহারাজ হেসে বললেন, 'বাড়ি ছেড়ে নতুন এসেছিস তো! একা একলা ঘরে থাকতে যদি ভয় পাস, সেই জন্যে এই ব্যবস্থা।' আমাদের সময়, একটি সুন্দর অনুষ্ঠানের আয়োজন হত। 'ভ্রাতৃ-বরণ' উৎসব, নতুন আসাসিকদের পুরানো আবাসিকরা ফল-মূল, মিষ্টি ইত্যাদি এবং একটি করে পুষ্পস্তবক হাতে তুলে দিতেন। আমরা ভাবতাম সত্যিই যেন আমাদের একটি নতুন বাড়িতে এলাম।

আমাদের অনুষ্ঠানের মধ্যে ছিল বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, সরস্বতী আরাধনা এবং নিজেদের পরিবেশিত নাটক। নাটকের মহড়ায় প্রিন্সিপাল মহারাজ প্রায়ই উপস্থিত থেকে আমাদের উৎসাহিত করতেন। প্রয়োজন বোধে কখনো তাঁকে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করতেও দেখেছি। আমার মনে আছে আমরা 'পল্লী সমাজ' নাটকটি মঞ্চস্থ করেছিলাম। আমি বেণীমাধবের ভূমিকায় ছিলাম। আশিস রায় হয়েছিল 'রমা'। আশিস পরে একসময় কিছুদিনের জন্য কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদেও অধিষ্ঠিত ছিলেন। এই প্রসঙ্গে নিজের একটা কথা খুব মনে হয় এখনো।

আমার অভিনয়ের সময় মঞ্চে এলেই সামনের দিকে কিছু কিছু কম-বয়সী দর্শকদের ফিস ফিস করে বলে উঠতে শুনেছি 'এই রে পাজিটা আবার এসেছে'। এতে আমি খুবই উৎসাহিত হয়ে ভাবতাম চরিত্রটা আমি ফুটিয়ে তুলতে পেরেছি! অভিনয়ের পর আমরা কয়েকজন 'রৌপ্য-পদক' পেয়েছিলাম। তারপর সিটি কলেজ, আইন-কলেজ এবং আন্তঃ কলেজ আয়োজিত অভিনয়ে সব সময় অংশগ্রহণ করেছি। ছাত্রজীবন পেরিয়ে এসেও শিল্পী সংসদ প্রযোজিত ছায়াছবি 'দুই-পৃথিবী' ও অন্যান্য ছায়াছবিতে মহানায়ক উত্তমকুমারের সঙ্গে অভিনয় করার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। প্রথম বর্ষে পড়ার সময় আমার একবার অসুখ হয়, বেশ কয়েক সপ্তাহ ভুগেছি। তখন মহারাজ স্বয়ং আমার সহপাঠি চিত্ত (বর্তমান স্বামী মুমুক্ষানন্দ) সব রকম সেবাযত্ন করে আমাকে সারিয়ে তুলেছিল। আমার দেশের বাড়িতে অসুস্থতার সংবাদ পেয়ে আমার পিতৃদেব ও মাতৃদেবী খুবই উদ্বেগ নিয়ে বেলুড়ে এসে উপস্থিত। সেই সময়ের ঘটনা থেকেই একটু সংযোজিত করছি— আমার পিতৃদেব মহারাজের অনুমতি প্রার্থনা করে বলেছিলেন আমাকে বাড়ি নিয়ে যেতে পারেন কি না। শুনে মহারাজ বললেন, 'সে কি! অর্ধেন্দু কি শুধু আপনাদেরই ছেলে? আমাদের কেউ নয়? জানবেন, যতদিন আমি আছি, ততদিন আপনার ছেলে আমাদেরও ছেলে।' তিনি কথা দিলেন, 'অন্ন পথ্য করার পর আমি ওর

বিশেষ ছুটির বন্দোবস্ত করে আপনাদের কাছে পাঠাব যাতে বেশ কিছুদিন সে নিজের বাড়িতে কাটিয়ে আসতে পারে।' পিতৃদেব আর বিরক্ত করতে পারেনি। তারপর আমাকে একজন ব্রহ্মচারীকে সঙ্গে দিয়ে শেয়ালদা থেকে টিকিট কাটিয়ে ট্রেনে বসিয়ে দিয়ে আসার পর নিশ্চিত হলেন। সেই সঙ্গে পিতৃদেব একটি পত্রও দিয়েছিলেন। এই যে অপরিমাণ স্নেহের ধারা তাঁর মন থেকে ঝরে পড়ত তার তুলনা হয় না।

সংসার জীবনে প্রবেশ করার পর (তখন তিনি স্বাস্থ্যর কারণে কলেজ থেকে অবসর নিয়েছেন) আমি একটা সরকারি কাজে নিযুক্ত হই। একদিন বিকেলে তাঁর সঙ্গে দেখা করে প্রণাম জানাতে গিয়েছিলাম। সঙ্গে নিয়েছিলাম সামান্য ফল-মিষ্টি ও একটি ধুতি। তিনি বললেন, 'আরে, এসব কি সামাজিকতা করছিস আমার সঙ্গে!' তিনি কিছু একটা লিখছিলেন। কলম থামিয়ে দেখি আমাদের জন্যে নিজেই চা তৈরি করতে যাচ্ছেন। আমি বললাম 'এ কি করে আমায় লজ্জায় ফেলছেন! একদিন আপনি চা খাওয়া পছন্দ করতেন না।' তিনি সহাস্যে বললেন, 'আরে, তোরা তখন ছোট ছিলি, নানা বিধি নিষেধ রাখার প্রয়োজন ছিল। এখন তোরা বড়ো হয়েছিস কত ভালো কাজ-কর্ম করছিস। তোরা আজকে আমার অতিথি!'

আরেকবার, খুব অপ্রত্যাশিতভাবেই ওঁর সঙ্গে জামতাড়ার (তখনকার সাঁওতাল পরগনা) হাটে দেখা। সব কালোমানুষের ভিড়ের মধ্যে গেরুয়াধারী সন্ন্যাসী। সহাস্যে প্রণাম করে জানলাম ওঁর একটু পেটের গোলমাল চলছে। তাই মিশন থেকেই ওখানকার আশ্রমে কিছুদিন থাকবার ব্যবস্থা হয়েছে। জল হাওয়া পরিবর্তনের জন্যে আমার সঙ্গে আমার স্ত্রী ও শ্যালিকা ছিলেন। ওরা প্রণাম করার পর বললেন, 'একদিন এসোনা তোমরা সকলে আশ্রমে বিকেলের দিকে।' আমরা গেলাম। তিনি শাক সবজির বাগান দেখালেন। প্রার্থনার সময় যথারীতি আমরাও যোগ দিলাম। হঠাৎ বলে উঠলেন, 'অর্ধেন্দু, তুই একটা গান শোনা!' আমি আশ্চর্যের সঙ্গে বললাম, 'গান তো আমি কোনো দিনই জানি না মহারাজ, সামান্য অভিনয় করতে পারি।'

প্রার্থনা শেষের পর তিনি একটু গল্প করলেন। এদিকে রাত হচ্ছে। আমার শ্যালিকারা বরাবর কলকাতার মানুষ। আমাকে প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতে উঠতে বলছেন। মহারাজের দৃষ্টি এড়াতে পারলেন না।

বললেন, 'এত ভয় কি মা? তোমাদের সঙ্গে আমার একটা জোয়ান ছেলে যাচ্ছে! তা ছাড়া এ জায়গাটায় সব সময়ই খুব শান্ত। হাতে হ্যারিকেন ও একটি লাঠি নিয়ে আমাদের সঙ্গে এসে আশ্রমের বাইরে বড়ো রাস্তায় তুলে দিলেন।' আশ্চর্য, হঠাৎ দেখি হাতে একটা পাকা পেঁপে। বললেন, 'আমাদের আশ্রমের ফল। তোমরা সকলে মিলে খেও।' সুস্থ অবস্থায় তাঁর সঙ্গে আমার সেই শেষ দেখা! তারপর কত বছর কেটে গিয়েছে—অথচ আজও মনে হয়, এই তো সেদিন!

উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল, ২০০৩

বিভাগ	ছাত্রসংখ্যা	৬০% এর ওপরে	৭৫% এর ওপরে	৮০% এর ওপরে	৬০% এর কম কিন্তু ৪৫% এর বেশী	৪৫% এর কম কিন্তু ৩০% এর বেশী	মোট
বিজ্ঞান	৭১	৭১	৫৪	৪৩	X	X	৭১
কলা	১৬	১৬	১	X	X	X	১৬

বিষয়গত সর্বোচ্চ নম্বর

পদার্থবিদ্যা	১৭৯
রসায়ন	১৭১
অংক	১৯৬
জীববিজ্ঞান	১৮১
সংখ্যাতত্ত্ব	১৯১
ইংরেজি	১৩৫
বাংলা	১৩৭
বাণিজ্য-অর্থনীতি	১৫৮
রাষ্ট্রবিজ্ঞান	১৪৩
ইতিহাস	১১৫
দর্শন	১৫৬
সংস্কৃত	১৫৮

লেটার মার্কস

পদার্থবিদ্যা	২৩
রসায়ন	১৫
অংক	৪৩
জীববিজ্ঞান	৪৩
সংখ্যাতত্ত্ব	৭
ইংরেজি	X
বাংলা	X
বাণিজ্য-অর্থনীতি	X
রাষ্ট্রবিজ্ঞান	X
ইতিহাস	X
দর্শন	X
সংস্কৃত	X

সিলেট ভ্রমণ

বাসব দাশগুপ্ত

২০০২ সালে ৮ মার্চ সকাল নতুন দিল্লি থেকে অজীত কৌরের একটি ফোন পেলাম। জন্মদিনের শুভেচ্ছার সঙ্গে তিনি প্রস্তাব দিলেন ফাউন্ডেশন অব সার্ক রাইটর্স অ্যান্ড লিটারচার-এর পক্ষ থেকে আমি যেন সপ্তাহ তিনেকের জন্যে বাংলাদেশ ঘুরে আসি। এই ভ্রমণের উদ্দেশ্যটিও তিনি বলে দিলেন— বাংলাদেশের মানুষজন, সংস্কৃতি এবং বর্তমান সাহিত্যের সঙ্গে প্রতিবেশী দেশগুলির পরিচয় ঘটানো।

অজীত কৌরের অনুরোধের মধ্যে এমন একটা আন্তরিকতা থাকে যে 'না' বলা কঠিন। তার ওপর ওঁর লেখারও ভক্ত আমি। 'খানা বাদোশ' নামে ওঁর আত্মজীবনীটি পড়ে চমকে উঠেছিলাম। স্বামীর অত্যাচারে যে মহিলা একদিন মেয়ের হাত ধরে রাস্তায় এসে দাঁড়িয়েছিলেন, তিনি ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে একদিন আত্মপরিচয়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করলেন। 'খানা বাদোশ' মুগ্ধ করেছিল অধ্যাপক শিবনারায়ণ রায়-কেও। সে-কথা তিনি লিখেওছিলেন।

পরের তিন সপ্তাহ বাংলাদেশের মানচিত্র নিয়ে পথের হিসেব-নিকেশ করলাম। আগে দু-বার ঢাকা গেলেও দেশটির অন্যান্য অংশ বিষয়ে তেমন কিছুই জানি না। বাংলাদেশ বিমান দপ্তরে ফোন করে বিমান-সূচি এবং খরচপাতির হিসাব সংগ্রহ করলাম। বাংলাদেশ দূতাবাসের এক বন্ধু সরকারি কিছু হোটেলের নামও দিলেন। শেষ পর্যন্ত ভ্রমণ-সূচিটি এই রকম দাঁড়াল— কলকাতা থেকে বিমানে ঢাকা, ঢাকার কাজ সেরে বিমানে বরিশাল, বরিশাল থেকে গাড়িতে যশোর, কুষ্টিয়া এবং রাজশাহি, রাজশাহি থেকে বিমানে ঢাকা। ঢাকা থেকে বিমানে চট্টগ্রাম, চট্টগ্রাম থেকে আকাশ পথে সিলেট, সিলেট থেকে উড়ে ঢাকা। ঢাকা থেকে উড়োজাহাজে কলকাতা।

কিন্তু ঢাকা পৌঁছে প্রথমদিন বিকেলেই আবিষ্কার করলাম ডানা দুটি খসে গেছে। সমস্ত ডলার হাওয়া। ফিরে আসব ঠিক করেছিলাম কিন্তু পুরনো বন্ধু শফি আহমেদ আটকে দিলেন। আকাশ থেকে মাটিতে নামতে হল। বাস, লঞ্চ, অটো রিকশা, রিকশা চড়ে বাংলাদেশ ভ্রমণ শুরু হল। বরিশাল, যশোর, কুষ্টিয়া ও রাজশাহি ঘুরলাম। নানা স্তরের এতো মানুষজনের সঙ্গে আলাপ হল যে নিজেকে বেশ সমৃদ্ধ লাগল। যেন ডলার হারিয়ে আমি অর্থের চেয়ে মূল্যবান আরো কিছু পেয়ে গেলাম।

কিন্তু এতখানি স্থল ও জলপথ ভেঙে শরীর আর টানছিল না। এপ্রিলের পারদও মাথা চাড়া দিচ্ছিল। তাই ফিরে আসি চট্টগ্রাম ও সিলেট বাদ দিয়েই। মাস পাঁচেক পরে সেপ্টেম্বরে আবার গেলাম ঢাকায়। চট্টগ্রাম ও সিলেট যাওয়ার পরিকল্পনা ছিল কিন্তু ঔপন্যাসিক মুহম্মদ হুদার ইচ্ছেয় ককস্‌বাজারও যুক্ত হল ভ্রমণ তালিকায়। তবে বর্তমান লেখাটিতে শুধু সিলেট ভ্রমণের কথা।

দুই

সিলেটের ট্রেন ধরতে বেরোলাম ৩০ সেপ্টেম্বর সোমবার সকাল ছ-টায়। ঢাকা শহরের শরীরে তখনও ঘুমের আমেজ। সবে আড়মোড়া ভাঙছে। দু-চারটে গাড়ি চলছে রাস্তায়। 'ক্রিসেন্ট মুন' চিহ্ন-দেওয়া একটা অ্যাম্বুলেন্সও দেখলাম। সকালে এই সময়ে এবং ভারী রাতে শহরে বেরোলে বছর ষাট-সত্তর আগের শহরের চেহারাটা খানিকটা আন্দাজ করা যায়।

রেল স্টেশনে গিয়ে দেখি সেখানে তৎপরতা খানিক বেশি। কেটলিতে জল ফুটছে, মানুষজন ছোটাছুটি করছে, ট্রেনের যাতায়াত নিয়ে লাউডস্পিকারে ঘোষণা চলছে। এক কাপ চা খেয়ে আর এক বোতল খনিজ জল হাতে নিয়ে ট্রেনের কামরায় হাজির হলাম। একটু পরেই গাড়ি ছাড়ল হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের সেই বিখ্যাত গান দিয়ে— ও নদীরে, একটি কথা শুধাই শুধু তোমারে/ বলো কোথায় তোমার দেশ/ তোমার নাই কি চলার শেষ?...

দু-পাশে ঢাকার শহরতলি ছাড়তে ছাড়তে ট্রেন এগিয়ে চলে। একসময় খালবিল ও মৎস্যখামার। মৎস্যখামারের গা দিয়ে চারটে হাঁস ধীর পায়ে হেঁটে চলে। গাড়ি চলতে চলতে ঢাকা বিমানবন্দরের রেল স্টেশনে। তার পর টংগী বাজার। পাশের ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ করলাম। বয়েস পঞ্চাশের কাছাকাছি, শরীর-স্বাস্থ্য ভালো। নাম আব্দুল হালিম। বাড়ি সিলেট বিভাগের মলয়বাজার জেলায়। ওঁর কাছে শুনলাম ঢাকার বড়ো বড়ো ব্যাবসাদারদের অধিকাংশই সিলেট কিংবা চট্টগ্রামের লোক। আর বিদেশে যেসব বাংলাদেশি আছেন তাদেরও অধিকাংশ সিলেট ও চট্টগ্রামের মানুষ। সিলেটের লোকজন ব্রিটেন, আমেরিকা ও কানাডাতে বেশি থাকেন আর চট্টগ্রামের মানুষজন মধ্যপ্রাচ্যে। দেশের মধ্যেও কাজের ভেতর জেলাভিত্তিক একটা বিন্যাস আছে। পুলিশের চাকরিতে কুমিল্লার লোক বেশি। সুনামগঞ্জের মানুষজনের চাকরির চেয়ে চাষে মন। ভালো ধান ফলায়। অন্যদিকে নোয়াখালি এবং চাঁদপুরের মানুষজনের অর্থনৈতিক অবস্থা তেমন ভালো নয়।

ওখানকার মানুষজনের অনেকে সিলেটে এসে প্রবাসী বাংলাদেশিদের বাড়িঘর ও চাষবাস দেখাশোনা করে। এর বিনিময়ে মাসে তিন-শো থেকে চার-শো ডলার পায়। সেই টাকা বাঁচিয়ে কেউ কেউ ছোটখাটো ব্যাবসা শুরু করে। পরে বড়ো ব্যাবসাদারও হয়ে যায় খেটে এবং বুদ্ধি খাটিয়ে।

আব্দুল হালিম মধ্যপ্রাচ্যের কাতারে যান ১৯৮৪ সালে। পরে আরো তিন ভাই যান সেখানে, চতুর্থ জন লন্ডনে। বর্তমানে তিন ভাই কাতার থেকে ফিরে এসেছেন, এক জন থেকে গেছেন। আর লন্ডনের ভাই বিদেশেই আছেন। দেশের তিন ভাই মিলে দু-টি লরি কিনেছেন। জাপানি ডাইনা লরি। নতুনটির দাম পড়েছে বারো লাখ, পুরোনোটি ন-লাখ। ড্রাইভারকে মাসে হাজার টাকা মাইনে দেন এবং দিনপিছু এক-শো টাকা হাতখরচ। দিনে গাড়িপিছু হাজার টাকার মতো রোজগার। লরির পাশাপাশি একটি ছোটো ব্যাবসা কেন্দ্র গড়ে তুলেছেন। পঁচিশটি দোকানঘর আছে সেখানে। প্রত্যেকটির ভাড়া মাসে দু-হাজার টাকা। এই ধরনের ব্যাবসা কেন্দ্র গড়ে তোলার পরিকল্পনা মাথায় আসে কাতারের সিটি সেন্টার দেখে। সেখানে দশ হাজার দোকান আছে। একজন আমেরিকান, একজন কাতারবাসী আর ভারতবর্ষের কেরালার এক ব্যাবসায়ী মিলে সিটি সেন্টারটি গড়ে তুলেছে। আব্দুল বললেন কেরালার লোকজন ছাড়াও বম্বের একজন ভালো ব্যাবসা করছেন মধ্যপ্রাচ্যের দুবাইয়ে। তাঁর বাড়িটা দেখার মতো। মালিককেও একবার দূর থেকে দেখবার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন দুবাইয়ের একজন। ভারতীয় ব্যাবসাদারের নাম জিজ্ঞেস করলাম। আবদুল বললেন, দাউদ ইব্রাহিম।

ট্রেন চলছে দ্রুত লয়ে। ডান দিকে প্রায় এক-শো বিঘে জলা জমিতে বিশাল এক পদ্ম বন। একটু পরেই নরসিংদী স্টেশন। শহরটি মেঘনা নদীর তীরে। পাট ও সুতোর কল আছে। তাঁতের কাপড়ের জন্যে নরসিংদীর খ্যাতি আছে। কলার চাষও ভালো হয়।

চাষের কথা উঠতেই আব্দুল জানালেন ওঁদের অঞ্চলে অন্যের হাতে চাষবাসে আর তেমন লাভ নেই। খেতমজুরদের দৈনিক বেতন দেড়-শো থেকে দু-শো টাকা। বাঁধা খেতমজুরদের মাসিক মাইনে তিন হাজার, থাকা-খাওয়া বাদে। অথচ চালের দাম কিলোতে দশ টাকা। ফলে অনেকেই আর বছরে তিনটে চাষ দিচ্ছে না।

গাড়ি থামল ভৈরববাজার জংশনে। শহরটি মেঘনা নদীর তীরে। এখানে দুটো পাটের কল আছে। স্টেশনের দু-পাশের দোকানগুলির সাইনবোর্ড দেখে মনে হল 'যমুনা সর্ষের তেল'-এর বেশ সুনাম আছে এ অঞ্চলে। মেঘনা নদীর ওপর সেতুটি বেশ লম্বা। শুনলাম আগে এর নাম ছিল ষষ্ঠ জর্জ ব্রিজ। ব্রিজ পেরিয়ে বেশ অনেকখানি যাওয়ার পর ব্রাহ্মণবেড়িয়া। সেখানে নদীর মাঝে চড়া। তাতে ধান চাষ হচ্ছে। তার পর আখাউড়া স্টেশন। ঢাকা থেকে ততক্ষণে তিন ঘণ্টা চলে এসেছি। স্টেশন চত্বরে ডাব, পেয়ারা আর কলার ঝুড়ি নিয়ে হকাররা ছুটোছুটি করে। কিছু পরে আবার গ্রামের পর গ্রাম। কাঁঠালের বিস্তৃত বাগান রেললাইনের দু-পাশে। একটা গ্রামের নাম চোখে পড়ল— বামুনপাড়া। সেখানে মাচার ওপর ঝিঙে ঝোলে। একটু পরেই বাঁশ বন। শজনে গাছ। ঝাঁকায় নানা রকম মনোহারি জিনিস নিয়ে ফেরিওয়ালা গাঁয়ে ঢোকে মেঠো পথ দিয়ে। একটা খাল এঁকে-বেঁকে এগিয়ে যায় গ্রামের দিকে। খেত লাল শাক। নোয়াপাড়া স্টেশন, গাড়ি থামে। একটু চলার পরে জানালার ধারে বসে

শাহ জালাল বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি ভবন। বামে হিমাদ্রিশেখর রায়, ডানদিকে লেখক

থাকা এক মহিলা হঠাৎ চিৎকার করে ওঠে। বাইরে থেকে হাত বাড়িয়ে কে তার গলার হার ছিনিয়ে নিয়েছে। পরের স্টেশন শায়েস্তাগঞ্জ হলেও ছিনতাইকারীকে ধরা কিংবা শাস্তি দেওয়া গেল না। একটু পরে রশীদপুর স্টেশন। আব্দুল নেমে গেলেন। আর খানিক পরে চোখে পড়ল চায়ের বাগান। চা গাছের পাশাপাশি আকন্দ গাছের বন, রেনট্রি, পাতিলেবুর বাগান। শ্রীমঙ্গল রেল স্টেশন। আবার ট্রেন চলে চা বাগানের ভেতর দিয়ে। ভানুগাছ স্টেশন পেরোয়, টিলাগাঁও স্টেশন আসে। সেই স্টেশন ছাড়িয়ে লংলা, গাড়ি দাঁড়ায় না। জানলা দিয়ে তাকিয়ে দেখি এক পরিত্যক্ত মন্দিরের গা বেয়ে উঠেছে বেশ কয়েকটা গাছ। নীচের দিকে কয়েকটা ইট দেখা না গেলে মন্দির বলে চেনাই যেত না।

কুলাউড়া স্টেশনে গাড়ি দাঁড়াল। আমার টিকিট ছিল এই পর্যন্ত। একজন রেলকর্মীকে বললাম। দু-একজন যাত্রী বললেন, কুলাউড়ার পর আর চেকিং নেই কাজেই টিকিট কাটার দরকার নেই। জিজ্ঞেস করলাম, স্টেশনের গেটে ধরবে না? ওঁরা বললেন, গেটের আগে দেয়ালের একটা অংশ ভাঙা আছে। ওদিক দিয়ে গলে গেলে কেউ ধরতে আসে না। বললাম, দেয়ালের ওই গর্তটি যদি খুঁজে না পাই? এবার ওঁরা আমার সমস্যাটা বুঝলেন। বাকি অংশের টিকিট কেনাতে আপত্তি করলেন না। বাকি অংশের টিকিটের দাম পঁয়ত্রিশ টাকা। টিকিট কেটে দেওয়ার জন্যে রেলকর্মীকে পনেরো টাকা বকশিশ দিলাম। রেলকর্মীটি আমাকে জানলার ধারে আসনের ব্যবস্থা করে দিলেন।

সোমিনছড়ার পর একটা ছোটো পাহাড় চোখে পড়ল। তার পর চা বাগান, ধানের খেত, বাঁশ বাগান। পাহাড় এক সময়ে মিলিয়ে গেল। জলাভূমি এবং ছোটো ছোটো গ্রাম। আলাপ হল সুবলসখা দত্তের সঙ্গে। সিলেটের কাছে একটি কলেজে পড়ান। দেশের বাড়ি সোনার গাঁ থানার বারুদিতে। ওখানেই জ্যোতি বসুর পৈতৃক বাড়ি। গ্রামের গা দিয়ে বয়ে গেছে ছাগলবাহিনী নদী।

স্টেশনে নামলাম। আমার থাকার ব্যবস্থা হয়েছে সিলেট রামকৃষ্ণ মিশনে। শফিদার অনুরোধে সিলেট বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের

প্রভাষক হিমাদ্রিশেখর রায় মিশনে গিয়ে মহারাজের সঙ্গে কথা বলে রেখেছে। রামকৃষ্ণ মিশন নায়েকপুরে, এটুকু ঠিকানাই হাতে ছিল। সুবলসখাবাবুকে জিজ্ঞেস করলাম রিকশাওয়ালা এটুকু তথ্যে যেতে পারবে কি না। সুবলসখাবাবু বললেন তিনি রিকশাওয়ালাকে বুঝিয়ে দেবেন। তাঁর সঙ্গে স্টেশনে নামলাম। তারপর চলতে চলতে দেখি সেই ভাঙা দেয়াল। বাইরে এসে রিকশায় চড়লাম। দরদাম করে দিলেন সুবলসখাবাবুই। বুঝিয়েও দিলেন। তার পর অসংখ্য রিকশার সঙ্গে ঠোকাঠুকি করতে করতে সুরমা নদীর ব্রিজের ওপর উঠলাম। সেখান থেকে আরও অনেকখানি পথ পেরিয়ে রামকৃষ্ণ মিশন।

তিন

মিশনের অধ্যক্ষ হচ্ছেন স্বামী চন্দ্রনাথানন্দ, 'মানিক মহারাজ' নামে বেশি পরিচিত। মহারাজ ওপরে ছিলেন, একজন ব্রহ্মচারী এসে অতিথি-নিবাসের ঘর খুলে দিলেন। বেলা তখন প্রায় তিনটে। ব্রহ্মচারী বললেন খাবার রাখা আছে, আগে যেন খেয়ে নিই। খাবার ঘরে ব্রহ্মচারী মহারাজই নিয়ে গেলেন। ভাতের সঙ্গে বেশ কয়েকটা পদ ছিল। শেষে এক বাটি গরম দুধ।

খাবার শেষ দিকে মানিক মহারাজ নীচে এলেন। আবাসিকদের সঙ্গে বসে ওপরে ক্রিকেট খেলা দেখছিলেন। খেতে অসুবিধে হল কি না জিজ্ঞেস করলেন। বললাম বেলুড়, পুরুলিয়া আর নরেন্দ্রপুর মিলে বারো বছর মিশনে থেকেছি, কাজেই কোনো অসুবিধে হয়নি। একবারই অসুবিধে হয়েছিল নরেন্দ্রপুরে। ভোর রাত থেকে আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নেমেছে। অখণ্ডানন্দ ভবনের সামনের লনটা প্রায় আট ইঞ্চি জলের নীচে। মাসটা সেপ্টেম্বর, ঝড়-বৃষ্টিতে বেশ একটু ঠাণ্ডা লাগছিল। ডাইনিং হলের ঘন্টি বাজল। খেতে গিয়ে দেখি চিঁড়ে, সঙ্গে এক বাটি হিমশীতল দধি। আসলে দই পাতা হয়েছে সন্ধের দিকে, বৃষ্টি নেমেছে ভোররাতে। শীত লাগছে বলে প্রায় পাঁচ-শো জনের পঞ্চাশ কেজির মতো দই ফেলে দেওয়া যায় না। চোখ বন্ধ করে ঠাণ্ডা দই-চিঁড়ে খেয়ে সে কি কাঁপুনি!

সিলেট রামকৃষ্ণ মিশনটি ছোটো কিন্তু সুন্দর। মিশনের দু-দিকে রাস্তা, এক দিকে পুকুর আর অন্যদিকে মানুষজনের বাড়ি। মিশনের ভিতরে একটি মাঝারি মাপের চত্বর। চত্বরের সামনে একটি চালা মতো, ওখানে দুর্গাপুজো হয়। চাতালের ডান দিকে অতিথি নিবাস। হোমিওপ্যাথি দাতব্য চিকিৎসালয় এবং বইঘর। চাতালের বাঁ-দিকে সুন্দর একটা মন্দির। মন্দিরের পেছনের দোতলা ছাত্রাবাস। মুরারিচাঁদ কলেজ, মদনমোহন কলেজ এবং সিলেট সরকারি কলেজের প্রায় চল্লিশজন ছাত্র ওখানে থাকে। এরই নীচে ডাইনিং হল। ছাত্রাবাসের পাশেই দোতলা একটি বাড়ির ওপরতলায় থাকেন মানিক মহারাজ এবং দু-জন ব্রহ্মচারী। নীচে অফিস ঘর এবং অতিথিদের জন্যে বসার ঘর। মানিক মহারাজ সিলেটে আসেন ১৯৯৩ সালে। তার আগে একটি ট্রাস্টি বোর্ড মিশন চালাতেন। কোনো সাধু ছিলেন না। ১৯৯২ সালে ভারতবর্ষে বাবরি মসজিদ ভাঙার পর রামকৃষ্ণ মিশনে হামলা হয় এবং অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটে। তার পরেপরেই মানিক মহারাজকে এখানে পাঠানো হয়।

একটু পরে হিমাদ্রি এল। বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা চলছিল বলে স্টেশনে যেতে পারেনি। হিমাদ্রির বাড়ি মাগুরাতে। ভারতবর্ষে বেশ কিছুদিন পড়াশোনা করেছিল। অভিনেতা পরিচালক রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্তের কাছে ইংরেজি সাহিত্যের পাঠ নেয়। বয়েস বছর পঁচিশের ভেতর। একাই থাকে সিলেটে। একজন মহিলা রান্নাবান্না করে দেন। একটা নতুন মোটরবাইক কিনেছে হিমাদ্রি। বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ মিটিয়ে প্রায় নিত্যদিন বিকেলে সিলেট বিমানবন্দরের দিকে চলে যায়। জায়গাটা যেমন ফাঁকা তেমন সবুজ।

হিমাদ্রির সঙ্গে গল্প করতে করতে সুপ্রিয় চক্রবর্তী এলেন। সুপ্রিয়বাবু ব্যবহারজীবী এবং সাহিত্য-সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক। তাঁর অন্য একটা পরিচয়ও আছে, তিনি বেগম সুফিয়া কামালের জামাই। সুপ্রিয়বাবু সিলেটের পুরোনো কথা বলছিলেন। ১৩০৩ খ্রীস্টাব্দে সিলেটে আসেন শাহ্ জালাল। তার পর এ-পর্যন্ত তিন-শো ষাটজন আউলিয়ার কর্মভূমি হয়েছে এই সিলেট। শ্রীচৈতন্যের বাবা জগন্নাথ মিশ্র এবং মা শচী দেবী ছিলেন সিলেটের মানুষ। তাই সিলেটের সঙ্গে চৈতন্যদেবের সম্পর্ক ছিল নিবিড়। চৈতন্যদেবের পার্ষদ অদ্বৈত আচার্য, মুরারি গুপ্ত, মাধব দাস, শ্রীবাস পণ্ডিত, রঘুনন্দন ভট্টাচার্য-সহ অনেকেই সিলেট থেকে নবদ্বীপে গিয়ে বসবাস শুরু করেন। ময়মনসিংহের ঐতিহাসিক গ্রন্থ 'স্বরূপ চরিত্র'-এ বলা হয়েছে :

শত শত শ্রীহট্টিয়া পিতার কাছে পড়ে।
অন্নদান করি পিতা রাখয়ে সবারে॥
বহু শ্রীহট্টিয়া বিপ্র নবদ্বীপে বৈসে।
সম্বন্ধবাদ চলে সেথা দেশে নাহি আইসে॥

সিলেটের কথা বলতে গেলে আর যাঁর কথা ফিরে ফিরে আসে তিনি হলেন হাসন রাজা (১৮৫৫-১৯২২)। তাঁর সব গান এখনও সংগ্রহ করা যায়নি কিন্তু শ-তিনেক গান ইতিমধ্যে সংকলিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ১৯২৫ সালে ভারতীয় দর্শন-মহাসভার অধিবেশনে হাসন রাজার উল্লেখ করেন, পরে অকস্‌ফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের হিবার্ট বক্তৃতাতেও হাসনের কথা বলেন। তাঁর বক্তব্য ছিল এইরকম :

পূর্ববঙ্গের একটি গ্রাম্য কবির (হাসন রাজা) গানে দর্শনের একটি বড়ো তত্ত্ব পাই সেটি এই যে, ব্যক্তিস্বরূপের সহিত সম্বন্ধসূত্রেই বিশ্ব সত্য। তিনি গাহিলেন :

মম আঁখি হইতে পয়দা আসমান জমীন
শরীরে করিল পয়দা শক্ত আর নরম
আর পয়দা করিয়াছে ঠাণ্ডা আর গরম
নাকে পয়দা করিয়াছে খুসবয় বদবয়।

এই সাধককবি দেখিতেছেন যে, শাশ্বত পুরুষ তাঁহারই ভিতর হইতে বাহির হইয়া তাঁহার নয়নপথে আবির্ভূত হইলেন।

হাসন রাজার মরমি-সাধক হয়ে ওঠার লোকায়ত কাহিনিটাও বেশ। একবার এক বাউল হাতে একতারা আর কাঁধে ঝুলি নিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল সুরমা নদীর তীরে। বেশ কিছুক্ষণ সুরমার ঢেউয়ের কুলুকুলু ধ্বনি শুনে একতারায় সুরটা তুলে নিল। তারপর ঢুকল লক্ষ্মণশ্রী গ্রামে। সে যখন বাজিয়ে জমিদার বাড়ির সামনে দিয়ে চলে যাচ্ছে, রাজাসাহেব ডাকলেন তাকে। বাউল কয়েকটা কথা বলেছিল রাজাসাহেবকে পার্থিব জীবনের নশ্বরতা নিয়ে। বাউলের একতারার সুর আর কথার মধ্যে অন্য এক জীবনের হদিশ পেলেন দাপুটে আর উড়নচণ্ডী রাজা। তিনি হয়ে গেলেন

হাসন রাজা। গেয়ে উঠলেন :

লোকে বলে, বলে রে, ঘরবাড়ি ভালা না আমার
কী ঘর বানাইমু আমি শূন্যের মাঝার॥

সুপ্রিয়বাবুর মেয়ে পরের দিন ইংল্যান্ডে যাবে আইন পড়তে। তিনি উঠলেন। হিমাদ্রি তার মোটরবাইকে চড়িয়ে আমাকে শাহ জালালের মাজার দেখাতে চলল। রাস্তার দু-পাশে দেখি ঝকঝকে মনোহারি দোকান, বড়ো বড়ো রেস্তোরাঁ, বিভিন্ন বিমান সংস্থার অফিস, মুদ্রা বিনিময়ের কাউন্টার, পরের পর দেশি-বিদেশি ব্যাঙ্ক, আর অত্যাধুনিক প্রাইভেট হাসপাতাল। সে-সবের চেহারা দেখে মনে হচ্ছিল ঢাকা কিংবা কলকাতা এর কাছে ম্লান। ট্রেনে আব্দুল গল্পের ভঙ্গিতে বলেছিলেন গোলামগঞ্জের সত্তর ভাগ মানুষ থাকে লন্ডনে আর বড়ো লেকা গ্রামের পঁচাত্তর শতাংশ মধ্যপ্রাচ্যে। সিলেট বিভাগের বাকি অংশের হিসেব দেননি কিন্তু সিলেট শহরে পাশ্চাত্য এবং মধ্য প্রাচ্যের সংমিশ্রণ ঘটেছে মনে হল।

শাহ জালালের মাজারের দু-পাশে বড়ো বড়ো বেশ ক-টা দোকান। দর্শনার্থীরা মাজারে যেসব জিনিস নিয়ে যায় সে সবই আছে দোকানগুলিতে। মাজারের চত্বরে ঢুকে দেখি অনেকগুলি সিঁড়ি বেয়ে মাজার। মাজারের পাশেই মসজিদ। তার আকার, সজ্জা ও রং দেখে বোঝা যায়, যেমন যত্ন নেওয়া হয়েছে তেমনই অর্থ ব্যয় করা হয়েছে। বাঁ-দিকে একটু দূরে অতিথি-নিবাস। ডান দিকে খানিক এগিয়ে বিখ্যাত সেই শোল মাছের পুকুর। সিলেটে আসব শুনে ঢাকা-চট্টগ্রামের অনেক বন্ধু বলেছিলেন শাহ জালালের মাজারের শোল মাছগুলো দেখে আসতে। আকারে নাকি বিশাল সব। কিন্তু সন্ধে হয়ে গেছে বলে জলের ভিতর চোখ গেল না। পুকুরের ওপারে দেখি ছোটো ছোটো চালার ভেতর বেশ কিছু মানুষ বসে আছেন। মনে হল গাঁ-গঞ্জের মানুষ, শাহ জালালের কাছে কিছু কামনাবাসনা নিয়ে এসেছে। শাহ জালাল তো এইসব মানুষদেরই আপনজন।

হিমাদ্রি চা খেতে নিয়ে গেল রেস্তোরাঁতে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ফলে হিমাদ্রির একটা আলাদা মর্যাদা রয়েছে এ-শহরে। যত্ন করে চা দিয়ে গেল। ভালো চা, কাছেই তো শ্রীমঙ্গল চা বাগান। চা খেয়ে সিগারেট কিনতে একটা ছোটো দোকানে গেলাম। ভারতবর্ষের সিগারেট তিন দিনের মাথায় শেষ হয়ে গেছে, তার পর থেকে বেনসন অ্যান্ড হেজেস খাচ্ছি। সে-সিগারেটই এক প্যাকেট চাইলাম। ছেলেটি জিজ্ঞেস করল, 'দেশি না বিদেশি?' ঢাকা, কক্সবাজার কিংবা চট্টগ্রামে এ-প্রশ্ন কেউ করেনি, তাই থমকে গেলাম। জিজ্ঞেস করলাম কোন প্যাকেটের কত দাম। ছেলেটি বলল, 'দেশি পঞ্চান্ন টাকা, বিদেশি একশ।' পঞ্চান্ন টাকা দিলাম। ছেলেটি মুখের দিকে তাকাল। কী বুঝতে চাইল কে জানে!

আশ্রমে ফেরার পথে গেলাম দরগাহ গেইট রাস্তার ওপর কেন্দ্রীয় মুসলিম সাহিত্য সংসদে। ঢোকার মুখে দু-পাশের দেয়ালে জ্ঞানচর্চার গুরুত্ব বিষয়ে কোরান থেকে উদ্ধৃতি। বই পড়া বিষয়ে প্রমথ চৌধুরীর উক্তির উদ্ধৃতিও রয়েছে। প্রবেশ পথের দু-পাশে সুন্দর বাগান। তার পর লম্বা সাহিত্য সংসদ ভবন। প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক হারুনুজ্জামান চৌধুরীর সঙ্গে আলাপ হল।

১৯৩৬ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর মুহম্মদ নূরুল হক দশঘোরী আরও কয়েকজনের সহযোগিতায় এই প্রতিষ্ঠন গড়ে তোলেনে। এর উদ্দেশ্য ছিল মুসলমান সমাজে সাহিত্যচর্চার ব্যাপক প্রচলন, বৃহত্তর সিলেটের বাংলাভাষী অজ্ঞাতনামা সাহিত্যিকদের রচনার সংকলন, প্রাচীন পুঁথি সংগ্রহ এবং মুসলমান সাহিত্য-সেবীদের সাহিত্যচর্চার সুযোগ করে দেওয়া। প্রথম কাজ শুরু হয় একটি কুঁড়ে ঘরে এবং ১৯৪৯ সালে বর্তমান সোলেমান হলে স্থানান্তরিত হয়। সংসদের গ্রন্থাগারটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল উনিশটি বই নিয়ে, এখন বইয়ের সংখ্যা পঞ্চাশ হাজারেরও বেশি। সংসদের পত্রিকা 'আল-ইসলাহ'-এর প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১৯৩২ সালে, মুসলিম সাহিত্য সংসদ প্রতিষ্ঠারও চার বছর আগে। প্রতিষ্ঠাপক সম্পাদক ছিলেন মুহম্মদ নূরুল হক। মনে হয় পত্রিকা সম্পাদনার ভেতর দিয়ে তিনি মুসলিম সাহিত্য সংসদ গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখেন। 'আল-ইসলাহ' আরবি শব্দ। 'ইসলাহ' মানে শুদ্ধীকরণ, উপকার, সংস্কার। বিশেষ অর্থে কুসংস্কার ও অনাচারের বিরুদ্ধে লেখার মাধ্যমে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ গড়ে তোলা। সাহিত্য সংসদের আদিপর্ব থেকেই সমাজ, শিক্ষা, সাহিত্য ইত্যাদি বিষয়ে বিভিন্ন সময়ে নানা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ১৯৪১ সালের ১৫ জানুয়ারি সভায় আলোচ্য বিষয় ছিল 'মুসলিম মহিলার উচ্চশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা'। দীর্ঘ সময় ধরে বাদানুবাদ চলে। শেষে সাত ভোটে প্রস্তাবটি বাতিল হয়। প্রস্তাব বাতিল হওয়ার চেয়ে জরুরি বিষয়টি হল মেয়েদের শিক্ষা নিয়ে যাঁরা বাদানুবাদ করেছিলেন তাঁরা সবাই পুরুষ। আজকের দিনে বোধ হয় এটি আর সম্ভব নয়। আমার বড়ো মেয়ে রিমার বয়স চৌদ্দ, দশম শ্রেণীতে পড়ে। কয়েক দিন আগে বলল স্বাধীনতা আন্দোলন, সমাজসংস্কার কিংবা সাহিত্যে বিশিষ্ট অবদান রেখেছেন এমন কারো ওপর একটি প্রবন্ধ লিখে দিতে হবে। আমি বললাম এটা এমন কিছু কঠিন বিষয় নয়। মহাপুরুষদের জীবনের ওপর যেসব সংকলন গ্রন্থ আছে তার একটা এনে দিলে ও নিজেই লিখে নিতে পারবে। রিমা বলল লিখতে ওর কোনো আসুবিধে নেই, তবে মহাপুরুষদের পরিবর্তে মহামহিলাদের জীবনী পেলেও চলবে।

ওঠার সময় 'আল-ইসলাহ' পত্রিকার চারটি সংখ্যা সংসদের তরফ থেকে উপহার দিলেন। সেখানে দেখি প্রফুল্লচন্দ্র রায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো বিশিষ্ট জনেরা এই প্রতিষ্ঠানে গেছেন এবং কাজকর্ম দেখে খুশি হয়েছেন। এখনও এই প্রতিষ্ঠানটি ধারাবাহিকভাবে সাহিত্যচর্চা করে চলেছে। 'আল-ইসলাহ' পত্রিকায় প্রকাশিত হচ্ছে কবিতা, গল্প এবং সিলেটি লিপি ও ভাষা, লোকসংস্কৃতি, সুফি সাধনা ইত্যাদি বিষয়ে বেশ কিছু মূল্যবান প্রবন্ধ।

১৯৫০ সালের ২৯ মে প্রফুল্লচন্দ্র রায় মুসলিম সাহিত্য সংসদে এসে দর্শনার্থী-খাতায় মন্তব্য করেন : 'শ্রীহট্ট মুসলিম সাহিত্য সংসদ দেখে খুশি হলাম। সাহিত্যের কোন জাত নেই—ইহা সার্বজনীন। কাজেই এই সংসদের নামও সার্বজনীন হলে সুখী হব।' বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়ে বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় কিংবা আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় নামগুলি আমাদেরও কোথাও আঘাত করে কারণ সাহিত্যের মতো শিক্ষা সার্বজনীন। কিন্তু ঔপনিবেশিক শাসনের একটি পর্বে আত্মপরিচিতির জন্যে এসবের প্রয়োজন দেখা গিয়েছিল। 'হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয়' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'আজ আমাদের দেশে মুসলমান স্বতন্ত্র থাকিয়া নিজের উন্নতিসাধনের চেষ্টা করিতেছে। তাহা আমাদের পক্ষে যতই অপ্রিয় এবং তাহাতে আপাতত আমাদের যতই অসুবিধা হউক, একদিন

পরস্পরের যথার্থ মিলনসাধনের ইহাই প্রকৃত উপায়।' প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয় ১৩১৮ বঙ্গাব্দে, আজ থেকে প্রায় নব্বই বছর আগে। তার পর ইতিহাসের ধারা অনেকবারই পরিবর্তিত হয়েছে আমাদের এই উপমহাদেশে। হিন্দু ও মুসলমানের আত্মপ্রতিষ্ঠার পর্বও প্রায় সম্পূর্ণ। কিন্তু এরই পাশাপাশি নতুন করে ধর্মান্ধতা জন্ম নিচ্ছে এই উপমহাদেশগুলিতে। হিন্দু ও মুসলমানের আত্মপ্রতিষ্ঠার পর্ব শেষ হওয়ার পর এখন সংখ্যালঘুদের নিজেদের ভিটেমাটিতে টিকে থাকার সামান্যতম অধিকারটুকু প্রতিষ্ঠা পাওয়া বোধ হয় জরুরি। তারা আজ নিরাপত্তাহীন, বড়োই অসহায়।

আশ্রমে ফিরে রাতের খাওয়া সারলাম। আবাসিকরা আশ্রম চত্বরে গল্পগুজব করছিল। দেবাশিস দেব, রিপনরঞ্জন দাস, হীরক রায়, শুভাশিস রায়চৌধুরী বন্ধুদের নিয়ে 'নিবেদন' নামে একটি দেয়াল-পত্রিকা বার করে। ওদের জিজ্ঞেস করলাম সিলেটের লেখালেখি নিয়ে। ওরা বলল আমি যেন সিলেট ছাড়ার আগে 'জনজীবনের কবি' দিলওয়ারের সঙ্গে দেখা করি।

রাতের আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নামল। তার ভেতরেই ঘুমিয়ে পড়লাম।

চার

সাকালে উঠে শাহ জালাল বিশ্ববিদ্যালয়ে যাবার জন্যে তৈরি হলাম। ওখান থেকে কবি দিলওয়ারের বাড়ি হয়ে স্টেশনে যাব। মহারাজ বললেন আরও দু-একটা দিন থেকে যেতে কিন্তু ফেরার টিকিট কাটা। বললাম আবার কোনো সময়ে এসে হাজির হব।

একটা রিকশা ধরে 'বেবি ট্যাক্সি' টার্মিনাসে এলাম। 'বেবি' পেতে দেরি হল না। উঠে দেখি ভেতরে লেখা আছে 'রাজনীতি নিয়ে আলোচনা থেকে বিরত থাকুন'। পাশে একজন বছর পঁচিশের যুবক বসেছিলেন। তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম এমন নিষেধাজ্ঞা কেন। যুবকটি বললেন তর্ক এমন গড়ায় যে হাতাহাতিতে পৌঁছে যায়। ড্রাইভারের পক্ষে তখন গাড়ি চালানো মুশকিল। গাড়ি বেসামাল হলে দু-পক্ষই পুকুর-ডোবায় ডুবে যেতে পারে। তখন লোকে ড্রাইভারকে দোষ দেবে। রাজনৈতিক কারণে যে 'বেবি' পালটি খেল সে-কথা কেউ বলবে না।

যুবকটির রসবোধ দেখে আনন্দ পেলাম। পশ্চিমবঙ্গেও বাস-ট্রেনে মাঝেমাঝেই রাজনৈতিক পারদ বেশ চড়ে যায়। একবার তারকেশ্বর-বাঁকুড়া সড়কে বসার আসন নিয়ে ঝগড়া রাজনৈতিক মোড় নেয়। কনডাক্টর আর সামলাতে পারে না। শেষে ড্রাইভার চড়া স্বরে সেই সময়ের একটি জনপ্রিয় লোকগীতি চালিয়ে দেয় টেপরেকর্ডারে—'ও ননদি আর দু-মুঠো চাল ফেলে দে হাঁড়িতে/ঠাকুর জামাই এল বাড়িতে।'

শাহ জালাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মুখে নামিয়ে দিয়ে অটো রিকশা চলে গেল। একটি রিকশায় চড়লাম। বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরটি বেশ বড়ো। রাস্তার দু-পাশে ফাঁক বেশ অনেকখানি জমি। একসময় শাহ জালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে পৌঁছে গেলাম। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে শুরু হলেও পরে মানবাত্মিক বিভাগ যুক্ত হয়। ইংরেজি বিভাগে যেতেই হিমাদ্রির সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। সেখান থেকে ইংরেজি বিভাগের প্রধান মোহম্মদ আতীউল্লাহের দপ্তর। ওখানে এসে হাজি হলেন বাংলা বিভাগের প্রভাষক শরদিন্দু ভট্টাচার্য। ওঁরা জানালেন ১৯৮৭ সালে শাহ জালাল বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্‌বোধন হলেও পঠনপাঠন শুরু হয় ১৯৯১ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে। সিলেটের শিক্ষাব্যবস্থা সম্বন্ধে বলতে গিয়ে ওঁরা বললেন শিক্ষায় উচ্চমানের ক্ষেত্রে মুরারিচাঁদ কলেজ একটা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে চলেছে। মুরারিচাঁদের পরিচিতি জানতে চাইলে অধ্যাপক আতীউল্লাহ একটি ছড়া বললেন :

হাওর তো হাকালুকি
আর সব কুয়া,
বাবু তো মুরারিচাঁদ
আর সব পুয়া

'হাওর' শব্দটি এসেছে 'সাগর' থেকে, অর্থ হল অথই জল। অনেক জলাশয় আছে কিন্তু 'হাকালুকি' জলাশয়টির কাছে বাকি সব কূপ। তেমনই অনেক 'বাবু' আছে কিন্তু মুরারিচাঁদের কাছে তারা নিতান্তই শিশু।

ইংরেজি বিভাগ থেকে গেলাম কম্পিউটার বিভাগে। সেখানের বিভাগীয়-প্রধান অধ্যাপক মুহম্মদ জাফর ইকবাল। অধ্যাপক হিসেবে তাঁর সুখ্যাতি যেমন দেশে-বিদেশে, লেখক হিসেবে তেমনই প্রতিষ্ঠা। তাঁর লেখালেখির সঙ্গে কিছুটা পরিচিত ছিলাম কিন্তু তাঁর সৃষ্টির বিস্তার যে কতখানি তা এবার বাংলাদেশে এসে বুঝলাম। কিশোর উপন্যাসের সংখ্যা তেরো, কল্প-বিজ্ঞানের বই কুড়িটি, ছোটোগল্প সংকলন চারটি, উপন্যাস দু-টি, কিশোর গল্পের সংকলন তিনটি, ভৌতিক গল্পের সংকলন দু-টি, 'কালাম' সংগ্রহ চারটি, ভ্রমণকাহিনি একটি, স্মৃতিচারণমূলক বই দু-টি, বিজ্ঞান-বিষয়ক গ্রন্থের সংখ্যা দুই, সংকলন গ্রন্থ পাঁচটি এবং সম্পাদিত গ্রন্থ একটি। দেখে মনে হল বয়েস পঞ্চাশের ভেতর, বইয়ের সংখ্যা সাতান্ন। এবং অনেক বই-ই পুনর্মুদ্রিত হয়েছে আট-দশবার। তাঁর গদ্যে কোনো মেদ নেই। ভাষা ঝলমলে নয়, ঝকঝকে। যেমন 'টুরিন টেস্ট' গল্পটি শুরু হয় এ-ভাবে :

রু চোখ তুলে তাকাল। মাথার কাছে জানালায় দৃশ্যটির পরিবর্তন হয়েছে। এর আগেরবার সেখানে ছিল নীল আকাশের পটভূমিতে উত্তাল সমুদ্রের ঢেউ, এবারে দেখাচ্ছে ঘন অরণ্য। দৃশ্যগুলি কৃত্রিম জেনেও রু মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে রইল। পৃথিবী ছেড়ে এই মহাকাশযানে ছায়াপথের কেন্দ্রের দিকে যাত্রা শুরু করেছে প্রায় তিন শতাব্দী আগে— আর কখনোই সেই পৃথিবীতে ফিরে যাবে না বলেই কী এই সাধারণ দৃশ্যগুলি এত অপূর্ব দেখায়?

কম্পিউটার বিভাগ থেকে হিমাদ্রি নিয়ে গেলেন ক্যান্টিনে। ভালো ব্যবস্থা—বিরিয়ানি মেলে। খেয়ে কবি দিলওয়ারের বাড়ির পথে রওনা হলাম। হিমাদ্রি সিলেটে এসেছে কয়েক মাস আগে, দিলওয়ারের বাড়ি তাই চেনে না। দু-একজনকে জিজ্ঞেস করতে তাঁরা বললেন ব্রিজ পেরলেই ভার্থখোলা। সেখানে গিয়ে জিজ্ঞেস করলে যে কেউ বলে দেবে। ভার্থখোলা পৌঁছে দেখি সত্যিই তাই। বুঝলাম কেন মিশনের আবাসিকরা বলেছিল দিলওয়ার 'জনজীবনের কবি'। কবির বাড়ির সামনে গিয়ে দেখি মধ্যবিত্ত বাঙালির পরিচিত ঘরসংসার। দিলওয়ারের বয়েস পঁচাত্তরের ওপরই হবে কিন্তু হাত বেশ উষ্ণ। জল-মিষ্টি খাওয়ালেন। খুবই জোর করছিলেন দুপুরে যেন ওঁর সঙ্গে বসে দু-টি ভাত খেয়ে আসি। হাতে সময় থাকলে ওইরকম আন্তরিক আমন্ত্রণ রক্ষা না করে উঠতাম না। একটি খবর শুনে ভালো লাগল যে ওঁর রচনাসমগ্র খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হচ্ছে।

কিন্তু হাতের কাছে একটিও বই পেলেন না। উঠে আসার সময় কিছুদিন আগে লেখা একটি ছড়া দিলেন যার শিরোনাম 'ক্রিকেটার অলংগাকে' :

ক্যাঙ্গারু কি গিয়েছিল এঙ্গোলায়?
প্রশ্ন করে কুয়োর ভেতর ব্যাংগুলায়।
সিঙ্গাপুরে সিঙ্গা বাজায় সিংহ কি?
কেউ দেখেছে হাতির মাথায় শৃঙ্গ কি?
গঙ্গা প্রেমে সংজ্ঞা হারায় গঙ্গারাম,
উরুর নাকি শুদ্ধ ভাষায় জঙ্ঘা নাম!

সংঘমিত্রা সংঘ গড়ায় ছিলেন কি?
বঙ্গ দেশে তার কিছু তেজ দিলেন কি?
ওলংগা কী কলিঙ্গ নাম জানতোরে?
রঙ্গ রসের ছড়ায় দিলাম ক্ষান্তরে।

কবি দিলওয়ারের বাড়ি থেকে উঠে স্টেশনের পথে চললাম। স্টেশনে পৌঁছে শুনি ট্রেন ছাড়বে সময়েই। উঠে পড়লাম। হিমাদ্রি বিদায় জানিয়ে চলে গেল।

ট্রেন চলতে শুরু করল। একটু পরে চা এল। পাশের আসনে বসে ছিল একটি তরুণ। আলাপ হল, নাম বদরুল ইসলাম। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতিতে অনার্স পড়ছে। ওর হাতে ছিল একটি রহস্য উপন্যাস—'বিষাক্ত থাবা'। কাহিনিকার কাজী আনোয়ার হোসেন। বদরুলের কাছ থেকে জানতে পারলাম কাহিনির নায়ক হচ্ছে মাসুদ রানা। বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের এক দুঃসাহসী স্পাই সে। গোপন মিশন নিয়ে দেশ-দেশান্তরে ঘুরে বেড়ায়। কোথাও অন্যায় অবিচার দেখলে রুখে দাঁড়ায়। তার পদে পদে বিপদ এবং মৃত্যুর হাতছানি কিন্তু সব জাল ছাড়িয়ে সে বেড়িয়ে আসে। বদরুলের হাতে বইটি হচ্ছে এই সিরিজের তিন-শোতম। অন্যান্য বইয়ের একটি তালিকাও আছে 'বিষাক্ত থাবা' বইটিতে। কয়েকটির নাম হল 'নীল আতঙ্ক', 'শয়তানের দূত', 'হাইজ্যাক', 'অন্ধকারে চিতা', 'বিষকন্যা', 'আই লাভ ইউ, ম্যান', 'অপারেশন বসনিয়া' এবং 'টার্গেট বাংলাদেশ'। বর্তমান বইটির পেছনের দিকে 'বাবু' নামে জনৈক পাঠক একটি চিঠি লিখেছেন লেখককে যা এই রকম :

আজ যে জন্যে এই চিঠি লেখা, রানার সবগুলো বই পড়ে আমার একটা ধারণা স্পষ্ট হয়েছে। তা হল পাঠকদের আপনি নির্মল আনন্দের পাশাপাশি নিষ্ঠুর ব্যথা দিতেও পছন্দ করেন। তা যদি না করতেন তাহলে অন্তত মামুনকে এত নির্মম মৃত্যু দিতেন না। কী ক্ষতি হতো, কাজীদা, প্রথম বুলেটটিই যদি ওর হৃদপিণ্ডে ঢুকিয়ে দিতেন?

মামুন চরিত্রটি কোন উপন্যাসের জানি না কিন্তু কাজীদা হচ্ছেন কাহিনিকার কাজী আনোয়ার হোসেন। পত্রলেখক 'বাবু' ধর্মে হিন্দু তাই লেখককে 'কাজীভাই' না বলে 'কাজীদা' বলে সম্বোধন করেছে। এককালে খুব রহস্যোপন্যাস পড়তাম, তাই শব্দের ইতরবিশেষ এখনও বুঝতে পারি। একটি শব্দ দিয়ে রহস্যের পুরো জাল খুলে ফেলা যায়।

ট্রেন দেরিতে চলছে। চোখ বন্ধ করে একটু ঘুমিয়ে নিলাম। ঢাকায় ঢোকার পরেও স্টেশনে পৌঁছোতে বেশ দেরি হল। ঘড়িতে তখন রাত এগারোটা পনেরো। একটা বেবি ট্যাক্সি পাওয়া গেল। কিন্তু ট্যাক্সি চালকের একটা শর্ত, এত রাতে গলিতে ঢোকানো চলবে না। ট্রেনে বসে ভাবছিলাম রাত হয়ে গেল, সোবহানবাগ যেতে অসুবিধেয় পড়ব না তো? 'বেবি'-র ড্রাইভারের সঙ্গে কথা বলে সাহস বেড়ে গেল। ভয় পেয়েছিলাম গাড়ির ড্রাইভার বে-পথে নিয়ে যাবে কি না। এখন এমন ড্রাইভার পেয়েছি যে ভয় পাচ্ছে গলিতে ঢুকিয়ে আমি তার গাড়ি কিংবা টাকাপয়সা ছিনতাই করব কি না।

খেয়েদেয়ে ঘন রাতে গভীর ঘুম।

পাঁচ

২ অক্টোবর বুধবার সকালে কবি হায়াৎ মামুদ এলেন। তাঁর সঙ্গে গল্প সেরে শফিদার সঙ্গে বাজারে বেরোলাম। হায়াৎদা থেকে গেলেন। ফিরে একসঙ্গে মধ্যাহ্নভোজন। কেঁচকি মাছ এনেছিলেন শফিদা, ফলে মাংসে মন ছিল না। খাওয়া শেষে ব্যাগ নিয়ে বিমানবন্দর যাত্রা।

বিমান ছাড়ল বিকেল সাড়ে তিনটেয়। জানলা দিয়ে বাইরে তাকালাম। বার চারেক বাংলাদেশে এসে নীচের ওই জলাভূমি, গাছপালা এবং মানুষজনের সঙ্গে কেমন যেন একটা আত্মীয়তা গড়ে উঠেছে।

বিমান ধীরে ধীরে মেঘরাজ্যে ঢুকে পড়ে। জীবনানন্দ বলেছিলেন, 'আবার আসিব ফিরে...এই বাংলায়'। আমি বলতে পারি না। মাঝে কাঁটাতারের বেড়া। আমাকে 'এই' এর পরিবর্তে 'ওই' বলতে হয়—ওই বাংলায়।

এ-বছর রবীন্দ্র পুরস্কার পেলেন বিদ্যামন্দির প্রাক্তনী ডাক্তার বিশ্বনাথ চক্রবর্তী তাঁর 'আমাকে চেনো' বইটির জন্য। তাঁকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।

সু-শাসন!

দুর্গাদাস গোস্বামী

সু-শাসন (Good Governance) বলতে অনেকে রামরাজত্বের প্রসঙ্গ তোলেন। অনাবশ্যকভাবে ব্রিটিশ শাসনের প্রতি দুর্বলতা প্রকাশ করেন। সময়ের তালে বিশ শতকে এই ধারণা কীভাবে বদলেছে এই প্রবন্ধে সেটাই আলোচ্য বিষয়। প্রথম ধারণাটি বহাল ছিল ১৯৩০ থেকে ১৯৭৩ সাল অবধি। এর পরিমার্জিত ধারণাটি চালু ছিল ১৯৭৪ থেকে ১৯৮৯ সাল পর্যন্ত। সাম্প্রতিকতম মতবাদটি মোটামুটি নব্বইয়ের দশক থেকেই গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে।

বিশ শতকে তিরিশের দশক থেকেই দেখা গেছে কোনো দেশের অর্থনীতির নিয়ন্ত্রণে সরকারের ভূমিকা ক্রমবর্ধমান। তা সে ব্যবসায়-চক্র নিয়ন্ত্রণ বা বেকার সমস্যা সমাধান বা সমাজিক সুরক্ষা অথবা গুরুত্বপূর্ণ শিল্পে বিনিয়োগ যা-ই হোক না কেন। রাষ্ট্রের সম্পদের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা পাছে বে-সরকারি উদ্যোগপতিরা কুক্ষিগত না করতে পারে সেজন্য সরকারের নিয়ন্ত্রণ কায়েম করাকে সুশাসনের অন্যতম মাপকাঠি হিসেবে ভাবা হত।

সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে রাষ্ট্রের এই অতিবর্ধিত (Over Extended) ভূমিকা স্বাভাবিক কারণেই ছিল বেশি। তথাপি ক্ষেত্র বিশেষে (যেমন সামাজিক সুরক্ষা, পরিবহন, ইত্যাদি) ধনতান্ত্রিক ও মিশ্র অর্থনীতির দেশগুলিতে এ জাতীয় নিয়ন্ত্রণ প্রবণতা খুব একটা কম ছিল না। এর একটি বড়ো কারণ হল গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় জনতোষণের প্রয়োজনীয়তা। আশির দশকের শেষে যখন 'ঠাণ্ডা যুদ্ধে'র অবসান ঘটল তখন থেকে তন্ত্রগত বালাই অনেকটা কমেছে। ইচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায় হোক, উন্নয়ন ও সরকারি পরিচালনার ক্ষেত্রে বিশ্ব ব্যাঙ্ক, আমেরিকা ও অন্যান্য উন্নত দেশ যা করে বিশ্বের বেশিরভাগ উন্নয়নশীল দেশ তাই করার চষ্টা করে। এখন দেখা যাক সু-শাসন নিশ্চিত করতে এদের ধারণা কেমনভাবে বিবর্তিত হয়েছে।

কেইনসীয় মতবাদকে ভিত্তি করে সত্তরের দশকের গোড়া পর্যন্ত উৎপাদন ও সরবরাহের ক্ষেত্রে সরকারের সর্বব্যাপী উপস্থিতিকে ভাবা হত সুশাসনের নমুনা হিসেবে। কৃষিতে সরকারি ভর্তুকি দিতে হত সারের দাম কমিয়ে কারণ বরিষ্ঠ সংখ্যক স্বল্পবিত্ত মানুষ কৃষিকাজে যুক্ত। ভর্তুকি না দিলে সরকারের জনপ্রিয়তা নিম্নমুখী হওয়ার ঝুঁকি আছে। একই কারণে রান্নার গ্যাসে, চিনিতে ভর্তুকি দিতে হত কারণ বেশ বড়ো সংখ্যক মধ্যবিত্ত মানুষ সরকারের প্রতি বিমুখ হতে পারে। সমাজের গুরুত্বপূর্ণ শিল্পে সরকারি নিয়ন্ত্রণ বহাল রাখা জরুরি ছিল কেন না সেগুলির মাধ্যমে বেকার সমস্যার কিছু সুরাহা হত আর যে কোনো রকমের একচেটিয়া প্রবণতাকে রাজনৈতিক ভাবে মোকাবিলা করা সহজ হত এই জন্য।

এহ বাহ্য। সব নিয়ন্ত্রণ যদি বে-সরকারি হাতে চলে যাবে তাহলে সরকারি কর্তাদের নিয়ন্ত্রণ করার আর থাকবেটা কি? নিয়ন্ত্রণ মানে তো ব্যক্তিগত বিবেচনা (discretion) প্রয়োগের অধিকার; অন্য অর্থে স্বজনপোষণ, পক্ষপাতিত্ব, অনচ্ছতা, অর্থকরী ব্যাপার-স্যাপার...। আর এ সব না থাকলে ক্ষমতায় থেকে লাভই বা কি?

এ সব কিছুর নিয়ন্ত্রণ তাহলে করা যাবে কিভাবে? কেন, বাজেট। বাজেটের মাধ্যমে উপকরণ (Input) বণ্টনের সমস্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত থাকছে নির্বাচিত ও নিযুক্ত আমলাকুলের হাতে। আর উপকরণ বণ্টন তো অপরিকল্পিতভাবে করা যায় না। শুরু হল বিভিন্ন মেয়াদের পরিকল্পনা— কোথাও বসল পরিকল্পনা কমিশন। যেন পরিকল্পনাটা ঠিকঠাক করে দিলেই সমস্যার সমাধান!

Public Choice Theoryর প্রবক্তারা বোমা ফাটালেন ১৯৭০ সালে। তাঁদের বক্তব্য, পরিকল্পনা ও তার প্রয়োগ এক জিনিস নয় বরং সম্পূর্ণ পৃথক। পৃষ্ঠাংক দিয়ে দেখালেন, অনেক সু-পরিকল্পনা হতাশাব্যঞ্জক ফল দেখিয়েছে কেবলমাত্র অপরিকল্পিত প্রয়োগের জন্য। দ্বিতীয়ত রাষ্ট্রের সম্পদের যাঁরা নিয়ামক তাঁরা তো সুবিবেচক ও অপ্রমত্ত মানুষ (rational being) কাজে কাজেই তাঁদের নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করার তাগিদ তো থাকবেই। এবং সেই কারণেই রাষ্ট্রের সম্পদের বিন্যাস বা বণ্টন করতে গিয়ে বাজারের তথা রাষ্ট্রের প্রয়োজন অপেক্ষা তাঁদের নিজস্ব রাজনৈতিক অথবা নিতান্ত ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধি বেশিরভাগ সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করবে এটাই স্বাভাবিক। অর্থাৎ রাষ্ট্রের অগ্রাধিকারের বিকৃতি ঘটে রাষ্ট্র নিয়ামকদের হাতেই।

সুতরাং সু-শাসনের জন্য তাঁদের দাওয়াই হল, দেশের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকাণ্ডে সরকারের নিয়ন্ত্রণ যত কমে ততই মঙ্গল। রাষ্ট্রের সম্পদের বিন্যাস হবে বাজারের চাহিদা ও জোগানের উপর ভিত্তি করে। অর্থাৎ, যে কারখানার উৎপন্ন সামগ্রী প্রতিযোগিতায় বিক্রি হয় না তাকে সরকারি ভর্তুকি দিয়ে বাঁচিয়ে রাখা অনভিপ্রেত। যদি তা করতে হয় তার অর্থ হল, যারা ঐ সংস্থায় কর্মরত তারা কম কাজ করেও (underperform) পুরো সুবিধা পাবে অথচ কারখানাটি বন্ধ করে দিলে অথবা বে-সরকারিকরণ করলে সরকারের বাজেটে যে অর্থের সাশ্রয় হতে

পারত এবং সেই অর্থে কিছু পিছিয়ে পড়া মানুষের প্রাথমিক শিক্ষা বা স্বাস্থ্যর সুযোগ করা যেত তারা বঞ্চিতই থেকে যেতে থাকবে। কিন্তু যেহেতু ঐ পিছিয়ে পড়া মানুষদের স্বর সংগঠিত শিল্প শ্রমিকদের অথবা অন্য স্টকহোল্ডারদের তুলনায় হ্রস্বনাদী, এই অনুজ্ঞা অনেক সরকারেরই না-পসন্দ হতে থাকল।

এই বৈষম্যের নিরিখে বিশ্বব্যাঙ্ক বললেন, রাষ্ট্রপরিচালনায় নির্বাচিত সরকারই একমাত্র নিয়ামক শক্তি হতে পারে না। রাষ্ট্রনীতি প্রণয়ন ও তার প্রয়োগে সবরকমের স্টকহোল্ডারদের অংশগ্রহণ জরুরি। এবং কেবলমাত্র এ-ভাবেই রাষ্ট্রনিয়ামকদের দায়বদ্ধতা ও প্রশাসনের স্বচ্ছতা সুনির্দিষ্ট ও সুনিশ্চিত করা সম্ভব। কিন্তু যে সব সদ্য-স্বাধীন ও উন্নয়নশীল দরিদ্র দেশে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও কাঠামো নড়বড়ে, যেখানে পিছিয়ে পড়া মানুষদের স্বর রাষ্ট্রনিয়ামকদের কাছ পর্যন্ত পৌঁছায় না সেখানে কিভাবে এই স্টকহোল্ডারদের অংশগ্রহণ সম্ভব? বিশ্বব্যাঙ্কের নিদান হোল, 'সিভিল সোসাইটি' অথবা জন সমাজ ভিত্তিক গণসংগঠনগুলি সরকার ও পিছিয়ে পড়া মানুষদের মধ্যে যোগসূত্র রচনা করবে।

কেউ কেউ আরও একধাপ এগিয়ে বললেন সরকার এ-তাবৎ কাল যে সব সামগ্রী বা সেবাকার্যের উপাদান ও সরবরাহ করেছেন সেগুলি সবই মেরিট গুডস্ নয় (অর্থাৎ সেই সব সামগ্রী নয় যার জন্য, যে যেমন ভোগ করবে তার ভিত্তিতে মূল্য নির্ধারণ সম্ভব। যেমন রাস্তার আলো, দেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা, পোলিও ভ্যাকসিনের ব্যবস্থা ইত্যাদি)। সরকারের কোনো দায় নেই Private goods সরবরাহ ও উৎপাদনের। সরকার শুধুমাত্র সেইসব সামগ্রী বা পরিষেবা সরবরাহ করবে যেগুলি সরকার না দিলে অন্য কেউ সরবরাহ করার নেই। অর্থাৎ কিনা ১৭৭৬ সালে অ্যাডাম স্মিথ যা বলেছিলেন যেখানে বাজার কার্যকর ভূমিকা নিতে পারে না শুধুমাত্র সেখানেই সরকারের উপস্থিতি কাঙ্ক্ষিত। যে সব সামগ্রী Private goods (যেমন বিদ্যুৎ, ইস্পাত ইত্যাদি), যার মূল্য নির্ধারণ ব্যক্তিবিশেষের প্রয়োজন ও ভোগের পরিপ্রেক্ষিতে সম্ভব—সেখানে সরকারি ভর্তুকি শুধু অবাঞ্ছিত নয় অনৈতিকও। বিদ্যুৎ উৎপাদনের যা ব্যয় সেখানে ভর্তুকি দেওয়ার অর্থ দাঁড়ায়, যে বেশি পরিমাণ বিদ্যুৎ ভোগ করে সে, যারা কম ভোগ করে বা আদৌ ভোগ করে না তাদের তুলনায় রাষ্ট্রীয় সম্পদের বেশি অংশ ভোগ করছে, যা কিনা রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে ভর্তুকি হিসেবে আসছে। তাহলে Horizontal Equity থাকল কোথায়? সুতরাং, সুশাসন সুনিশ্চিত করতে হলে ভর্তুকি ওঠাও। ফেল কড়ি মাখো তেল। একই যুক্তিতে বিভিন্ন ধরনের Toll goods যেমন সড়ক, সেতু, বন্দর ইত্যাদি তৈরি করার দায়িত্ব তাদেরই যারা এটি ব্যবহার করবে, সবার নয়। একজন বহু জাহাজের মালিক যিনি নতুন বন্দরের সুবিধা নিয়ে তার উৎপাদন খরচ কমাচ্ছেন ও মুনাফা বাড়াচ্ছেন, তার জন্য সাধারণ আধা-চাষি বা সাধারণ করদাতার প্রদেয় অর্থ রাষ্ট্রীয় কোষাগার ব্যয় করবে কোন্ যুক্তিতে? তো শুরু হয়ে গেল, যেখানে যেখানে সম্ভব, ব্যাপকভাবে বে-সরকারীকরণ। প্রতিযোগিতায় সেই টিকে থাকবে, যে সবচেয়ে কমদামে উচ্চমানের সামগ্রী বা পরিষেবা জোগান দিতে পারবে।

এই প্রেক্ষাপটে নিউজিল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া প্রমুখ ধনতান্ত্রিক দেশগুলি, এমনকি চীন-এর মতো সাম্যবাদী দেশও মোটামুটি ১৯৭৯ সাল থেকেই অর্থনৈতিক ক্রিয়াকাণ্ডে সরকারি আধিপত্যের বহর ছাঁটতে শুরু করে। এই প্রচেষ্টা যে কেবল খেয়ালবশে বা পরীক্ষা নিরীক্ষার জন্যই তা নয়, বরং অনেকক্ষেত্রেই বাধ্য হয়ে। সত্তরের দশকের মাঝামাঝি পেট্রলজাত দ্রব্যের দাম এমন বেড়ে যায় (Oil-Pool-shock) যে বিশ্বের বেশিরভাগ সরকারই তাদের আয় ব্যয়ের ভারসাম্য বজায় রাখতে হিম-সিম খেতে থাকে। অলাভজনক সরকারি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান বিক্রি করে একদিকে যেমন রাষ্ট্রের কোষাগারে অর্থের জোগানে সুরাহা হল, অন্যদিকে অনুৎপাদক শিল্পের বোঝা থেকে সরকার, সুযোগ বুঝে, নিজেকে ভারমুক্ত করে নিল।

এতে কোথাও কোথাও ফল হল হিতে বিপরীত। হঠাৎ করে বিভিন্ন অর্থনৈতিক ক্ষেত্র থেকে সরকার হাত ওঠানোয় বিঘ্নিত হল সরবরাহ। আবার কোথাও, যে অসম সুবিধাগুলি এ যাবৎ সরকারি মালিকানাধীন সংস্থাগুলি ভোগ করে আসছিল সেগুলির ভোগ শুরু করল বহুজাতিক সংস্থাগুলি। একচেটিয়া ব্যাবসার স্বাভাবিক প্রবণতা বেড়ে এমন অবস্থা হল যে উৎপাদনে দক্ষতা বাড়লেও উপভোক্তারা তার কোনো সুফল তো পেলই না বরং একচেটিয়া পুঁজিবাদের দুষ্টব্রণের কবলে বিদ্ধ হতে থাকল। তাই প্রয়োজন হয়ে পড়ল বিভিন্ন স্টকহোল্ডারদের স্বার্থ সুরক্ষিত করতে সরকারের নিয়ন্ত্রণকারী ভূমিকা (Regulator)। কোনো কোনো ক্ষেত্রে পুঁজিপতিরা রাষ্ট্রীয় পরিকাঠামো এমনভাবে কুক্ষিগত করল বা আটকে রাখল যে বহু ক্ষেত্রে এমনকি পানীয় জল সরবরাহ করার ক্ষেত্রেও পুঁজিপতিদের অনেক অনৈতিক দাবি সরকার মেনে নিতে বাধ্য হল।

কোথাও আবার, বিশেষত সাহারা সন্নিহিত আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলিতে, কোনো শিল্পের আশাতিরিক্ত সাফল্যে ঈর্ষান্বিত হয়ে সম্পূর্ণ জাতিগত বিদ্বেষজনিত কারণে কিছু মানুষ শুরু করে দিল মার-দাঙ্গা-লুঠ-পাট। যাঁরা বিনিয়োগ করবেন তাঁদের যদি সম্পত্তির ও প্রাণের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়, ব্যক্তি-উদ্যোগীরা বিনিয়োগে কেনই বা উৎসাহী হবেন? অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ল, আইনের শাসন কায়েম করার সরকারের দায়। অর্থাৎ, এইসব সুরক্ষার জন্য সরকার এমন সব আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগ করবেন যা ব্যক্তি উদ্যোগপতিদের বিনিয়োগে উৎসাহিত করে তুলবে। সরকার এখানে অনুঘটকের (factlitator) ভূমিকায়।

আশির দশকের শেষে সু-শাসন সম্পর্কে বিশ্ব ব্যাঙ্ক নতুন কিছু মাত্রা যোগ করেন। Sturctural adjustment lending এর মাধ্যমে সেই বিধান বিভিন্ন উন্নয়নশীল দেশে সঞ্চালিত হতে থাকল। এখন শুধু সরকারের নিয়ন্ত্রণ কমালেই চলবে না, কমাতে হবে সরকারের বহরও, রুখতে হবে বাজেট-ঘাটতি, বাড়াতে হবে সরকারের বিভিন্ন স্তরে দায়বদ্ধতা ও স্বচ্ছতা। অন্যভাবে বললে দাঁড়ায়, সরাসরি সামগ্রী বা সেবাকার্যর উৎপাদন ও সরবরাহ প্রক্রিয়ায় অংশ নেবে না ঠিকই কিন্তু সেই সব কাজ যাতে ব্যক্তি-উদ্যেগপতিরা সুষ্ঠুভাবে করতে পারে তার অনুকুল পরিবেশ তৈরি করার জন্য সরকারের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা বাড়ানো প্রয়োজন। এর ফলে সরকারি অপচয় যেমন কমানো সম্ভব, তেমনি সাশ্রয় হওয়া অর্থে রাষ্ট্রের সামগ্রিক পরিকাঠামো উন্নয়ন সম্ভব। তবে পরিকাঠামো বলতে যে শুধু সড়ক-সেতু-বিদ্যুৎ-পরিবহন ব্যবস্থা বোঝাবে না, বলাই বাহুল্য। শিল্প বিকাশ উপযোগী পরিমণ্ডল গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজন দায়িত্বশীল, দক্ষ ও শিক্ষিত মানব সম্পদের স্থিতিশীল জোগান সুনিশ্চিত করা। তার জন্য

বিনিয়োগ প্রয়োজন শিক্ষায়, গবেষণায়, স্বাস্থ্যে, শিল্পচর্চায়, ইত্যাদিতে।

সুতরাং, সুশাসনের অর্থ দাঁড়াল রাষ্ট্র ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ থেকে সরকারের অন্তর্ধান নয় বরং রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ শক্তিকে পরিপুষ্ট করা যাতে করে বিকাশোপযোগী পরিবেশ তৈরি করা সম্ভব হয়। ১৯৯৪ সালে বিশ্বব্যাঙ্ক বললেন যে সরকার জনগণের কাছে বৈধ বলে বিবেচিত, যে সরকারের শাসন জনগণের প্রতি রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক স্তরের নিয়ামকদের দায়বদ্ধতা সুনির্দিষ্ট করতে পারে; সমাজের ও মানবিকতার বিকাশ সাধনের জন্য ও আইনের শাসন সুনিশ্চিত কররার জন্য নীতি নির্ধারণ ও তাদের যথাযথ প্রয়োগ ঘটাতে সক্ষম তাকেই সুশাসন হিসেবে বর্ণনা করা যায়। ১৯৯১ সালে হারারেতে কমনওয়েলথও একই কথার প্রতিধ্বনি করেন, একটু জোর ছিল যাতে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সমানাধিকার বজায় থাকে তার প্রতি। ইউ.এন.ডি.পি. জোর দিল 'ধারাবাহিক মানবিক বিকাশের' ওপর।

অতএব দেখা গেল সুশাস্ন বলতে প্রথমে বোঝানো হত সমস্তরকম অর্থনৈতিক ক্রিয়াকর্মে সরকারের সরাসরি অংশগ্রহণ। পরবর্তী কালে সেটা হল সরকারের ন্যূনতম সরাসরি অংশগ্রহণ। এই দুটি বিপরীতধর্মী অনুজ্ঞার সংশ্লেষে সাম্প্রতিকতম ধারণাটি হল, সরকার সরাসরি অংশ নেবে না ঠিকই তবে নিয়ন্ত্রণ করার অধিকার ও ক্ষমতা পূর্ণমাত্রায় বজায় থাকবে। এর ফলে উৎপাদন ও সরবরাহ করার যে ব্যবস্থাপনা ঝুঁকি (Managment risk) সেটা কমবে, বে-সরকারি উদ্যোগীদের প্রশাসনিক ও প্রযুক্তিগত উৎকর্ষের সুফল জনগণ পেতে পারবে ও সাধারণ করদাতার দেয় অর্থের মূল্য (Value for money) যথার্থ ব্যবহারের সুযোগ থাকবে। ইতিমধ্যে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার নিয়মকানুনের জেরে বেশিরভাগ দেশের বাজার বিশ্ববাজারের অংশবিশেষ। তাই পূর্ণাঙ্গ প্রতিযোগিতা অপ্রতিরোধ্য। দেশীয় প্রতিষ্ঠানকে আড়াল করার সুযোগ কম। তাই ভোগকারীদের সুবিধা হওয়ার কথা। দুষ্ট ব্যক্তিরা বলেন, প্রতিযোগিতার আড়ালে বহুজাতিক সংস্থার লম্বা হাত, এই সব কিছুর সুফল তারাই পেয়েছে বেশি যাদের আছে অনেক। তারা পায় নি, যাদের আছে কম। এই তাহলে সু-শাসন!

লেখা চাই

'প্রাক্তনীবার্তা'-র জন্য লেখা পাঠান। দয়া করে এ-ফোর কাগজের বাঁদিকে এক ইঞ্চি মার্জিন রেখে লিখবেন। বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করবেন না। করলেও বাংলা হরফে লিখবেন। নিজের সম্পূর্ণ নাম, ঠিকানা এবং বিদ্যামন্দিরের বর্ষকাল উল্লেখ করবেন লেখার শুরুতে। কেবলমাত্র সাদা-কালো ছবি পাঠাবেন।

অতীতের পাতা থেকে

রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির দ্বারোদ্‌ঘাটন উৎসব সম্পন্ন

স্বামীজীর আদর্শ শিক্ষায়তন পরিকল্পনা বাস্তব রূপ গ্রহণের পথে

গত শুক্রবার বেলুড় রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দিরের দ্বারোদ্‌ঘাটন উৎসব নবনির্মিত কলেজ হলে সম্পন্ন হইয়াছে। সকালে ছাত্রাবাসের দ্বারোদ্‌ঘাটন, ভজন, পূজা, চণ্ডী, উপনিষদ ও গীতাপাঠ এবং ভোগ আরতি ও হোম হয়। মধ্যাহ্নে মঠের সন্ন্যাসীগণ ও ডা. মহেন্দ্রনাথ সরকার, স্যার হরিশঙ্কর পাল প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ সহ এক শোভাযাত্রা ছাত্রাবাস হইতে যাত্রা করিয়া বিদ্যামন্দিরের হলঘরে সমবেত হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের দুইখানি সুদৃশ্য ফটোসহ মিশনের ভাইস প্রেসিডেন্ট স্বামী অচলানন্দ ও স্বামী শঙ্করানন্দ শোভযাত্রার পুরোভাগে গমন করেন। একজন সন্ন্যাসী অগ্রে অগ্রে শান্তিবারি সিঞ্চন করিতে থাকেন ও সন্ন্যাসীগণ সমস্বরে শান্তিবচন উচ্চারণ করেন। সভাগৃহে উচ্চ বেদীর উপর ফটো দুইখানি স্থাপিত হইলে সভার কার্য আরম্ভ হয়। স্বামী অচলানন্দ দ্বারোদ্‌ঘাটন কার্য সম্পন্ন করেন। দ্বারোদ্‌ঘাটন প্রসঙ্গে স্বামীজী বলেন, ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রধান শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ জগতের কল্যাণার্থ মানুষ গঠনের জন্য একটি আদর্শ শিক্ষায়তন নির্মাণ করিবার যে পরিকল্পনা করিয়াছিলেন, তাহা আজ বাস্তবে পরিণত হইতে চলিয়াছে। ভারতের সনাতন আদর্শকে অবলম্বন করিয়া আমাদের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবন গড়িয়া তুলিবার প্রকৃত কেন্দ্রস্থলরূপে যেন এই শিক্ষামন্দির গড়িয়া উঠে এবং প্রাচ্যের বেদান্ত ও পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানের অপূর্ব সমন্বয় সাধন করিয়া এই প্রতিষ্ঠানটি যেন ভাবীকালে জগতে একটি সর্বাঙ্গসুন্দর বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হইতে পারে। ইহাই শ্রীশ্রীঠাকুর ও স্বামীজীর চরণে আমার আন্তরিক প্রার্থনা।

কলেজের প্রিন্সিপ্যাল স্বামী তেজসানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণবন্দনা আবৃত্তি করেন। ভজনগানের পর সমবেত পাঁচশত লোকের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

অপরাহ্নে রামনাম কীর্তন, ভজন ও প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

বর্তমানে বিদ্যামন্দিরে ইন্টারমিডিয়েট স্ট্যাণ্ডার্ড পর্যন্ত পড়াইবার অনুমতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে পাওয়া গিয়াছে। ক্রমে ইহাকে প্রথম শ্রেণীর কলেজে পরিণত করিবার আয়োজন হইয়াছে। হাওড়া হইতে ৪ মাইল দূরবর্তী বেলুড় মঠের বিস্তৃত সীমানার মধ্যে কলেজের দ্বিতলবাড়ি অবস্থিত। ইহার সংলগ্ন ত্রিতল বাড়িতে ছাত্রাবাসের ব্যবস্থা হইয়াছে। তাহাতে প্রায় একশত ছাত্র থাকিবার বন্দোবস্ত রহিয়াছে। যাহারা ছাত্রাবাসে থাকিবে কেবল তাহারাই কলেজে পড়িতে পারিবে।

(আনন্দবাজার পত্রিকা, ৫ই জুলাই ১৯৪১, শনিবার, ২১শে আষাঢ় ১৩৪৮)

লেখক-পরিচিতি

স্বামী দেবরাজানন্দ (১৯৬৫-৬৮)
বেলুড়মঠ ব্রহ্মচারী মিশন কেন্দ্রের অধ্যক্ষ।

গৌতম গোস্বামী (১৯৭৩-৭৬)
স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার অধিকারিক এবং রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির প্রাক্তনী সংসদের যুগ্ম সম্পাদক।

তপনকুমার ঘোষ (১৯৬৯-৭৩)
অর্থনীতির অধ্যাপক এবং বিদ্যামন্দির প্রাক্তনী সংসদের সম্পাদক।

দিব্যেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৫৪-৫৬)
রাষ্ট্রীয় সংস্থা টায়ার কর্পোরেশনের প্রাক্তন চেয়ারম্যান ও ম্যানেজিং ডাইরেক্টর। বর্তমানে ম্যানেজমেন্ট কনসালটেন্ট।

রামকৃষ্ণ রায় (১৯৬২-৬৫)
ইন্‌সপেক্টর জেনারেল অব পুলিস, হেড কোয়ার্টার্স।

অয়ন বিশ্বাস (১৯৯৩-৯৫)
কবি। পেশা শিক্ষকতা।

সলিল মুখোপাধ্যায় (১৯৭৩-৭৬)
ডানককুনি কোল ইন্ডিয়া লিমিটেডের সিনিয়র এক্‌সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়র।

অর্ধেন্দুশেখর দাশগুপ্ত (১৯৪৫-৪৭)
একসময়ের বিশিষ্ট চলচ্চিত্র অভিনেতা।

রামকুমার মুখোপাধ্যায় (১৯৭৩-৭৬)
সাহিত্য অকাদেমির পূর্ব ভারতের সচিব।

দুর্গাদাস গোস্বামী (১৯৭৪-৭৬)
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুগ্ম জেলা শাসক।